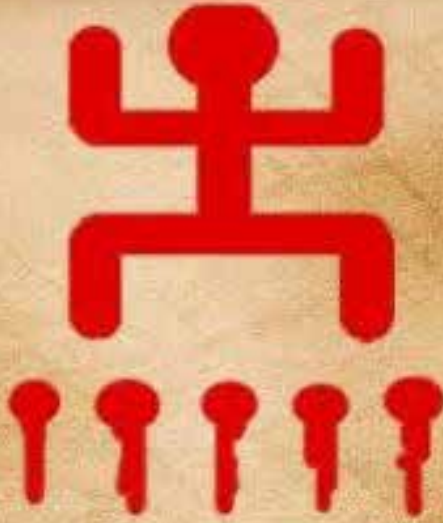


বঙ্গ
টাইমস

১৬ এপ্রিল, ২০২৩



শুভ

নববর্ষ!



সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

কুন্তল আচার্য

কড়া বার্তা দেওয়ার সময় এসেছে

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত আসলে গ্রীষ্মের

তিন রূপ

তুষাণ রুদ্র

নববর্ষের আড্ডায় দাদাঠাকুর

স্বরূপ গোস্বামী

ফিচার

আর কেউ চাঁদে যেতে পারল না!

শুভেন্দু মাগুলা

সেদিন চৈত্রমাস

অন্তরা চৌধুরি

বিনোদন

রাজস্থানেও দিব্যি উতরে গেলেন
একেনবাবু

ম্নেহা সেন

পুরনো সিরিয়াল ফেরানো যায় না!

বৃষ্টি চৌধুরি

খেলা

ডাগআউটে বসতে হিম্মৎ লাগে

অজয় নন্দী

মিডিয়া সমাচার

বাংলাস্বিয়ারের নদী বইতে থাকুক

হরিশ মুখার্জি

ওপেন ফোরাম

এবার ভাঞ্জে বলার সময় এসেছে

রঞ্জিম মিত্র



ভ্রমণ

গোলপাহাড়ের টিলায় বসে

শ্যামল মুখার্জি

পলাতক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

শান্তনু দেশাই

বুকিং ছাড়াই পাহাড়ি গ্রামে

শুভেন্দু দেবনাথ

নিয়মিত বিভাগ

নন্দ ঘোষের কড়চা

ফিরে দেখা

লাইফস্টাইল

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সন্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন— ২৪৪৫ ৫৬৫৭

ই-মেল: bengaltimes.in@gmail.com, ওয়েবসাইট: bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

শুধু একটি বছর

আরও একটা নতুন বছর। অবশ্য নতুন বছর বললেই আমরা ইংরাজির ক্যালেন্ডার বদলের কথা ভেবে নিই। বাংলাতেও যে আলাদা একটা বছর আছে, সেটা আমরা ভুলেই যাই। বাংলার কোন মাস চলছে, অনেকেই বলতে পারি না। তারিখ তো দূর অস্ত। এমনকী এটা কোন বছর, সেই প্রশ্নেও অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। বিস্তর ভাবার পর একটা ভুল উত্তর। আসলে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে এভাবেই বাংলা যেন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে।

পয়লা বৈশাখ অবশ্য কতগুলো অনুষ্ঙ্গ নিয়ে আসে। আমরা নতুন পাঞ্জাবি পরি। শাড়ি আর গয়নার দোকান বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দেয়। কোন বাঙালি রেস্টোরাঁয় কী বিশেষ বাঙালি মেনু আছে, তা নিয়ে কাগজে ফিচার বেরোয়। টিভি খুললেও অ্যাঙ্করদের পরণে একটু অন্যরকম পোশাক। একটু অন্য রকমের আড্ডা, অনুষ্ঠান। আর সকাল হলেই হোয়াটসঅ্যাপের সুবাদে নানা রকমের পয়লা বৈশাখের মেসেজ। আমাদের বাঙালিয়ানা এটুকুতেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে বাংলার চর্চা থেকে অনেকটা বিরতই থাকি। আমাদের বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে যাওয়া বহুকাল আগেই শুরু করেছে। ইদানীং যেটা দেখা যাচ্ছে, তা হল, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও বাংলা থাকছে না। সেখানেও বাঙালি বাড়ির ছেলেরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিকে বেছে নিচ্ছে। ফলে, আগে যে একটা পেপার বাংলা পড়তে হত, সেটুকুও আর হচ্ছে না। অভিভাবকরাও পরম গর্বে বলে বেড়াচ্ছেন, ‘ওর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো হিন্দি। ওদের স্কুলে বাংলা পড়ানোই হয় না।’ স্কুলগুলিরও গর্বের সীমা নেই। অন্য কোনও রাজ্যে মাতৃভাষার প্রতি এমন উপেক্ষা আছে কিনা জানা নেই।

বাংলা এফএম-এ একটা বকচ্ছপ বাংলা বলা হয়। কিউকি, কেনকী এসব শব্দ আমাদের দৈনন্দিন সংলাপে অহরহ ঢুকে পড়ছে। সিরিয়ালের হাত ধরেও অবাধে ঢুকে যাচ্ছে হিন্দি গান। বাঙালির বিয়ে বাড়ির মেনু কার্ডও বদলে গেছে। বিয়ের আসরে এখন মেহেন্দি আর সঙ্গীত। পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টে যাচ্ছে। গত এক বছরে একটা বই পড়েছেন, এমন বাঙালির সংখ্যা কত? রাজ্যের মোট বাঙালির ১ শতাংশ এমন পাওয়া যাবে? চারপাশ দেখে মনে তো হয় না। এক বছরে একটা ভাল বাংলা সিনেমা দেখেছেন, সেই সংখ্যাটাই বা কত? এক্ষেত্রেও সংখ্যাটা ২ শতাংশের বেশি হবে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা, গত এক বছরে অন্তত একবার লাইব্রেরি গেছেন, এমন বাঙালি কত? এক্ষেত্রেও সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই এক শতাংশে পৌঁছবে না। এই নিয়ে কোনও সমীক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে, চারপাশে তাকালেই ছবিটা বোঝা যায়।

নতুন বছরে আমরা তাহলে কী করব? বাংলা ডেড ল্যান্ডস্কেপ, এটা বলে একটা বিকৃত আনন্দ পাব? নাকি হাহুতাশ করে যাব? এসব পন্থা ছেড়ে নিজেদের জীবন যাপনে যেন একটু হলেও বাংলাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই চেষ্টাই বোধ হয় করা উচিত। না, বাংলা ভাষার জন্য মিছিল করতে হবে না, প্রাণ দিতেও হবে না। মাসে অন্তত একটা ভাল বই পড়া, একটা ভাল বাংলা ছবি দেখা, অন্তত একটা চিঠি লেখা, কয়েকটা গান শোনা— এটুকু তো করতে পারি। তাহলেও পরের প্রজন্ম কিছুটা বাংলার ছোঁয়া পাবে। এটুকুও যদি না পারি, তাহলে পয়লা বৈশাখের পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরে আদিখ্যেতা না করাই ভাল।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক
বেঙ্গল টাইমস



কুন্তল আচার্য

পয়লা বৈশাখ ব্যাপারটা ঠিক কী? যখনই এই তারিখটা আসে, নানারকম জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হাজির হয়ে যায়। ভারতের কোন কোন রাজ্যে কী নামে তা পরিচিত। কোন রাজার হাত ধরে কীভাবে এর বিস্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কেউ একটা যদি ফেসবুকে ছাড়ল, তাহলে তো কথাই নেই। একদল সেটাকে শেয়ার করতে ব্যস্ত রইল। আরেকদল বলা নেই, কওয়া নেই, কপি পেস্ট করে নিজের নামে ঝোঁপে দিল। তারপর সারাদিন লাইক গুনতে লাগল।

যাক গে সেসব কথা। আমাদের ছোটবেলাটা ছিল বড় অদ্ভুত। আমাদের সময় টিভিও সেভাবে মফস্বলে ঢোকেনি। আর সেলফোন, গুগল, ফেসবুক তো অনেক পরের ব্যাপার। এসব শব্দ তখন কালের গর্ভে। সে ছিল এক নিখাদ আনন্দের দিন। এমনিতে তখন শীত অনেকটাই লম্বা ছিল।

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

এই সময়টায় পরীক্ষার ঝঙ্কুটি ছিল না। এই সময়টায় গাজন, মেলার ধুম। কবে কোথায় মেলা হবে, তার একটা মোটামুটি ক্যালেন্ডার ছিল। সেই অনুযায়ী আশেপাশের কোনও মেলা বাদ দিতাম না।

কিন্তু পয়লা বৈশাখ ছিল অন্য কারণে



আনন্দের। দোকানগুলো দারুণভাবে সেজে উঠত। অনেক দোকানের বাইরে ফুল টাঙানো হত। ঝাড়পোছ চলত। অনেক দোকানের বাইরে চেয়ার পেতে, ছোটখাটো প্যান্ডেল সাজানো হত। যেসব দোকানে সারা বছরের টুকটাক কেনাকাটা, সেইসব দোকানে একবার করে হাজিরা দেওয়া। কোনওটা বড়দের সঙ্গে। কোনওটা আবার বন্ধুদের সঙ্গে। কোনও দোকানে মিষ্টির প্যাকেট। কেউ আবার বসিয়েই মিষ্টি খাওয়া-তেন। দোকানিদের প্রণাম করতাম। অন্যান্য বড়দেরও প্রণাম করতাম।

তবে মিষ্টি বা লাড্ডুকে ঘিরে অবশ্য আমাদের সেই আবেগ ছিল না। তাই আমরা খোঁজ নিতাম, কোন দোকানে লসি খাওয়াচ্ছে। কোন দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াচ্ছে, কোন দোকানে আইসক্রিম দিচ্ছে। ছোটদের জন্য এইসব আয়োজনও থাকত। আমাদের সময়ে গোল্ড স্পট বলে এক ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস ছিল। এমন সুন্দর একটা পানীয় কোথায় যে হারিয়ে গেল! এভাবেই কত দোকানে যে তুঁ মারতাম! দোকানিরাও ছিলেন দিলখোলা। সেই দোকানে জিনিস না নিলেও তাঁদের মধ্যে নি-মন্ত্রণের ছুঁমার্গ ছিল না। ডেকে ডেকে খাওয়াতেন। আমরাও সেই মতো আশপাশে ঘুরঘুর করতাম।

প্যাকেটগুলো নিয়ে বাড়িতে ফিরতাম। আর দেওয়া হত ক্যালেন্ডার। ওতে অবশ্য আমাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। কারণ, বাংলা ক্যালেন্ডার মানেই বড্ড বোরিং। সেই ঠাকুর দেবতার ছবি। ওতে তেমন মতি ছিল না। ফলে, সেগুলো ঘরের লোকেদের

হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের ধন্য করতাম।

তখন পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল হালখাতা। অনেক দোকানে নাকি ধার দেনা শোধ করতে হয়। অনেকে দেখতাম, দোকানির হাতে কয়েকশো টাকা ধরিয়ে দিচ্ছেন। দোকানিও সেগুলো খাতা দেখে মিলিয়ে নিচ্ছেন। কেউ আবার হিসেব-টিসেবে যাচ্ছেন না। কে কত জমা করল, জাস্ট লিখে রাখছেন। হিসেবে পরে হবে। আমরা অবশ্য এসব চক্করে ছিলাম না। আমাদের টাকা কোথায় যে ধার মেটাতে! ও বাবা-কাকাদের কাজ। আমরা বুঝি লসি, আমরা বুঝি কোল্ড ড্রিঙ্কস। কে কেমন খাওয়াল, এটাই ছিল আমাদের কাছে সেই দোকানের ইউএসপি। কার দোকানে মাল কেমন, কে সস্তায় দেয়, কার ব্যবহার কেমন, এগুলো বড়রা বুঝুক, আমাদের বুঝতে বয়েই গেছে।

সবমিলিয়ে আমাদের কাছে পয়লা বৈশাখ ছিল অন্য এক উন্মাদনা। যার অনেকটাই হারিয়ে গেছে। এখনকার পয়লা বৈশাখের সঙ্গে সেদিনের সেই নির্মল আনন্দের কোনও তুলনা হবে না। সত্যিই, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত

আসলে গ্রীষ্মের তিন রূপ

তৃষাণ রুদ্র

জিজ্ঞাস করুন, এটা বাংলার কোন সাল। অধিকাংশক্ষেত্রেই আপনি সঠিক উত্তর পাবেন না। উত্তরদাতা হয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন। নইলে, উনিশশো, দুহাজার এইসব বলে খমকে যাবেন। নইলে অতি চালাকি করে এড়িয়ে যাবেন। বলবেন, এখন এগুলো মনে রাখার কোনও দরকার নেই। এগুলো সব সেকেলে ব্যাপার।

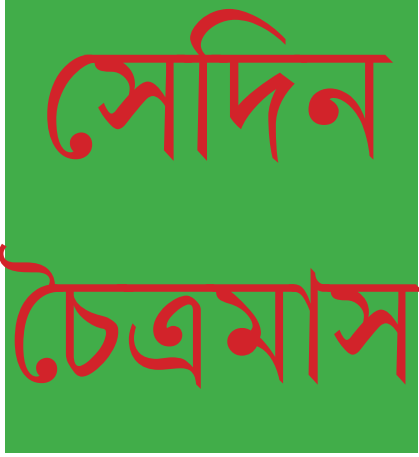
সত্যিই তাই, বাংলা সাল, বাংলা তারিখ এগুলো কেমন যেন গুরুত্ব হারিয়েছে। অবশ্য এর জন্য প্রকৃতির খামখেয়ালিপনাও অনেকটাই দায়ী। ছোট থেকে যে ঋতুচক্রের কথা পড়েছিলাম, সেই সব ঋতু গুলো কোথায় যেন ভ্যানিস হয়ে গেল। আচ্ছা, শরৎ কাল কালে বলে? হেমন্ত বা বসন্ত বলেও কার্যত কিছুই নেই। শুনতাম, পৌষ-মাঘ এই দুম মাস নাকি শীতকাল। ও হরি, কোথায় বা কী? মেরেকেটে শীত এখন দশ-বারো দিনের অতিথি। তাও একটানা নয়। জানুয়ারির শুরুতে হয়ত একঝটিকায় তিনদিন। দিন পনেরো পরে অস্তিত্বের জানান দিতে হয়ত আরও তিন-চার দিন। আর বর্ষা! মাঝে মাঝে টানা হয় ঠিকই। কিন্তু সেও আর দু'মাসের ঋতু

নেই। সবমিলিয়ে দিন পনেরো।

তাহলে, মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল? বছর অন্তত দশ মাস গরম কাল। বাকি দু'মাসের কিছুটা বর্ষা, কিছুটা শীত। বাঙালির এখন ঘরে এসি, অফিসে এসি, পার্টি অফিসে এসি, ক্লাবঘরেও এসি। ফলে, ঘরকুনো বাঙালি ঘরের মধ্যে থাকলে গরমটা বুঝতেও পারে না। বাইরে বেরোলে বুঝতে পারে। কিন্তু বাইরে বেরোনোও কমিয়ে দিয়েছে। আর ঘরে আটকে রাখার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে এসেছে স্মার্টফোন। সে সারাদিন স্মার্ট ফোনেই মুখ গুঁজে। ফলে, ঘরের ভেতরের বা বাইরের ঋতুচক্র নিয়ে ভাবতে তার বয়েই গেছে। সে খুব গরম এলে বড়জোর, দু'একটা গরমের পোষ্ট শেয়ার করে।

আমাদের ছোটবেলায় শরৎকাল, বসন্তকাল নিয়ে রচনা আসত। কেউ কেউ ঝেড়ে মুখস্থ করত। আবার কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে এটা-সেটা কিছু একটা লিখে আসত। এখনকার যা সিলেবাস, বোধ হয় এসব রচনা আর আসে না। আর এলেও বানিয়ে লেখা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ, শরৎকালের সঙ্গে বসন্তকালের কী ফারাক, দৈনন্দিন জীবনে তা বুঝে ওঠার সত্যিই কোনও উপায় নেই। দুটোই আসলে গরমকালের দুই রূপ।

স্মৃতিটুকু থাক



অন্তরা চৌধুরি

কথায় বলে চৈত্র মাস মধুমাস। অবশ্য এখন এই কথা কাউকে বললে একটা মারও আমার পিঠের বাইরে পড়বে না। কারণ গত কয়েক দিনের তীব্র দাবদাহে চৈত্র মাসকে আর অন্তত মধুমাস বলা যায় না। বরং যা লু বইছে, ধু ধু মাস বলা যেতে পারে। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন সারা বছর ধরে এই চৈত্র মাসের জন্যই অপেক্ষা করতাম। স্মৃতির সরণি বেয়ে আবার একটু ফিরে যাই ছোটবেলায়।

চৈত্র মাস পড়তে না পড়তেই আমাদের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ছোট ছোট জনপদে শুরু হয়ে যেত শিবের গাজন। আমরা দিন গুনতাম, কবে সেই গাজন দেখতে যাব! মনে আছে, একবার অনেক ছোটবেলায় পিসিমণির শ্বশুরবাড়ি

বর্ধমান জেলার মিঠানীতে গিয়েছিলাম। সেখানে খুব জাঁকজমক সহকারে চব্বিশ প্রহর হয়। আমার কাছে তখন ‘চব্বিশ প্রহর’ নামটা নতুন ছিল। মানেটাও বুঝতাম না। পরে জানলাম, সারা দিন-রাত ধরে নাম হরি নাম সংকীর্তনকেই চব্বিশ প্রহর বলে। সেই নাম গান এক মিনিটের জন্যও থামবে না। এক দল কীর্তন করে উঠে যেতে না যেতেই আরেকদল কীর্তন শুরু করে দেবে। সেই উপলক্ষ্যে গোটা গ্রাম জুড়ে বিশাল মেলা বসত। গ্রামে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে অতিথি। খাওয়া দাওয়ার এলাহি আয়োজন। ওদিকে চৈত্র মাসের শুরুতেই আমাদের বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে শুরু হয়ে যায় ধারার মেলা। সেই শুরু। তার পর এক এক করে এক এক জায়গায় গাজন শুরু হয়ে যায়।

আমি তখন বেশ ছোট। অর্থাৎ বাবা, কাকার সাইকেলে চেপে অনায়াসেই ইতি উতি ঘুরে বেড়াতে পারি। আমার তিন কাকাই আমাকে বড় বেশি ভালোবাসত। এক একজন কাকার একেক রকম বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই ছোট্ট বয়সে আমি ছিলাম তাদের প্রাণের সঙ্গী। একদিন খবর পেলাম, আমাদের বাড়ির কাছে শালবনীতে গাজন হচ্ছে। বাবুকাকা বলল, ‘চল আজকে তুই আর আমি মেলা দেখতে যাব।’ সন্ধ্য বেলায় আমি তো রেডি হয়ে বসে আছি। কিন্তু বাবুকাকার পান্তা নেই। কারণ, তিনি ছিলেন অন্য কাকাদের তুলনায় একটু অতিরিক্ত শৌখিন। ঘন্টাখানেক ধরে স্নানটান সেরে বেশ ধোপদুরস্থ জামাকাপড় পরে তাঁর আবির্ভাব হল। এক বলক দেখলে মনে হবে বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। চুলে শ্যাম্পুর গন্ধ আর বিল ক্রিমের গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। গালটা বেশ চকচক করছে। চুল ফুবফুর করছে।



কম বয়সে বাবুকাকাকে অনেকটা রাজেশ খান্নার মতোই দেখতে ছিল। অসম্ভব ফর্সা, তার সঙ্গে মিশেছে লালচে আভা। তার সাইকেল খানাও পক্ষীরাজ ঘোড়ার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। অর্থাৎ সেই সময় রাস্তা দিয়ে গেলে লোকজন বেশ তাকাত। তারপর সন্ধ্যাবেলায় বাবুকাকার সেই পক্ষীরাজে চেপে আমরা পৌঁছে গেলাম শালবনীর গাজনে। সেখানে আমাদের বাড়িতে যে মাছ দিত, সেই নিতাই কাকুর বাড়ি ছিল, সে আমাদের মেলায় দেখতে পেয়ে টানতে টানতে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তারপর লুচি, ঘুগনি, পায়েস, মিষ্টি বেশ জম্পেশ করে খাইয়ে তবে ছাড়ল।

এদিকে, গাজন ততক্ষণে বেশ জমে উঠেছে। চারিদিকেই অজস্র লটারির দোকান। সে বিভিন্ন রকমের লটারি। সবচেয়ে বেশি ডিম লটারি। সাবান লটারি থেকে শুরু করে নারকেল তেল লটারিও রয়েছে। লটারি ব্যাপারটা কী অত ছোট বয়সে আমি ঠিক বুঝতাম না। কিন্তু দেখতে বড় ভালো লাগত। বাবুকাকা অনায়াসে ডিম লটারি

খেলতে বসে গেল। তখন ডিম লটারি ছিল কুড়ি পয়সার। দেখি যেখানেই পয়সা দিচ্ছে সেখানেই ডিম পেয়ে যাচ্ছে। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। প্রথম পর্যায়ে প্রায় চল্লিশ খানা ডিম পাওয়া গেছে। আমার তো খুব আনন্দ। আমি বরাবরই ডিম খেতে বড় ভালোবাসি। ভাবছি কখন বাড়ি গিয়ে ডিমগুলো সাঁটাব। তার পর শুরু হল বাবুকাকার সাবান লটারি খেলা। তখন বেশ বড় বড় মোতি সাবান ছিল। সেবারে বাবুকাকা প্রায় কুড়িখানা মোতি সাবান আর পাঁচখানা নারকেল তেলের কৌটো জিতল।

কিন্তু লটারি ওরফে ডিম জেতার নেশা কঠিন নেশা। বাবুকাকা আবার ডিম লটারি খেলতে শুরু করল। তারপর বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরলাম। গুণে দেখা গেল মোট সাতষট্টি খানা ডিম পাওয়া গেছে। তখন বাড়িতে অনেক লোক যদিও। সকলেরই বেশ দু তিনখানা করে ভাগে জুটবে। সেই নিয়ে বেশ মজা সকলেরই। এদিকে গোটা দুয়েক নিয়ে খেতে গিয়ে দেখি খোলা ছাড়ানোই যাচ্ছে না। কারণ ভালো করে সেন্দ্র

হয়নি। তখন বাড়িতে গ্যাস ছিল না। কাজেই অত রাত্রিরে আবার অতগুলো ডিমকে মাটির খোলায় সেদ্ধ করে ঠাকুমা রান্না করল। সেদিন বাড়ির সকলে মিলে পরমানন্দে খাওয়া হল ভাত আর লটারি থেকে পাওয়া ডিমের ঝোল।

তার পর থেকে বাবুকাবাবর সঙ্গে গাজন দেখতে যাওয়াটা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এই সমস্ত প্রত্যন্ত গ্রামীণ মেলা বা গাজনে একটা অদ্ভুত আনন্দ বা মাদকতা আছে; যা অধুনা কর্পোরেট মেলায় নেই। প্রাণ নেই। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল হাতে ঘোরানো নাগরদোলা। কাঠের তৈরি সেই ছোট্ট নাগরদোলায় চাপতে কী ভালোই না লাগত! যে লোকটা ঘোঁরাতে সে মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করত। আর নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে আনন্দে মেশানো এক অদ্ভুত হাসি আমাদের কিছুতেই থামত না। এখন মনে হয় কত দিন সেই হাসি হাসিনি। তারপর যখন কাকাদের সঙ্গে সাইকেলে চাপার বয়স ফুরোল, তখন মা কাকিমাদের সঙ্গে মেলায় যেতাম। আমি, মা, কাকিমা, ভাই আর কুটুস। এই জুটিটা আমাদের দারুণ ছিল।

মেলাতে ঘুরতে ঘুরতে ধুলোর চোটে মাথার চুল লাল হয়ে যেত। কিন্তু রুমাল দিয়ে নাখ ঢাকার বালাই ছিল না। সেই ধুলো ছিল বড় মিষ্টি। কত বিচিত্র খাবার যে এই সমস্ত মেলায় পাওয়া যেত তার ঠিক নেই। বাবাই গাজনের সময় ভোরবেলায় এজেন্সির যেত। আর সেখান থেকে নিয়ে আসত কুলগুঁড়ো। ওই কুলগুঁড়ো শুধুমাত্র এজেন্সির গাজনেই পাওয়া যেত। গ্রীষ্ম কালের দিনে নুন, লঙ্কা, তেল দিয়ে ওই কুলগুঁড়ো মেখে ভাত খাওয়ার স্বাদই আলাদা। তবে শুধু কুলগুঁড়ো নয়। আসন্ন বৈশাখের কথা ভেবে তার

সাজ সরঞ্জাম ওই চৈত্রের মেলাতেই কিনে নেওয়া হত। যেমন তালপাতার পাখা, মাটির কুঁজো, কলসী, মাদুর, লাটাই, শীতলপাটি ইত্যাদি। তখনকার দিনে বড় বেশি লোডশেডিং হতো। তাই সেই গ্রীষ্মের দুপুরে কুজোর জল খেয়ে মাটিতে শীতলপাটি বিছিয়ে ঠাকুমার কাছে শুয়ে পড়তাম। ঠাকুমা সারা দুপুর তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করত আর রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলত। এখন মনে হয় সে এক রূপকথার জগৎ ছিল।

তারপর এই চৈত্র বৈশাখ মাসে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যে বেলায় হতো হরির লুঠ। তুলসী থানে পূজা করার পর চারিদিকে বাতাসা ছড়ানো হতো। আমাদের সব ভাইবোনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত সেই বাতাসা কুড়োনার। আর সেই বাতাসাগুলো খেতে কেন যে এত ভালো লাগত বুঝি না। ছোটবেলার সব কিছুই বড় মধুময়, বড় প্রাণময় তাই না!

এখন ফোনে খবর পাই অমুক জায়গায় গাজন হচ্ছে, মেলা বসেছে। ভেতরটা ছটফট করে। কলকাতার এই জনবহুল মহানগরীতে বসেও একাকীত্বের দীর্ঘশ্বাস আরও আরও প্রগাঢ় হয়। তবে সেই গাজনে যাওয়ার অভ্যেসটা বাবুকাবাবু আজও বজায় রেখেছে। তবে একা নয়, কুটুসকে নিয়ে যায়। সেই ঝাঁ চকচকে সাইকেলটা আর নেই। বাহন এখন মটর বাইক। বাবুকাবাবু আগের মতো ঝাঁ চকচকে নেই। সময়ের পলেস্তার শরীরে পড়লেও মনে অন্তত পড়েনি। তাই আজও বাবুকাবাবু ডিম লটারি খেলে। সাতষট্টিটা না হোক; অন্তত গোটা দশেক তো আনেনি। আর টাইম মেশিনে চেপে আজও বাবুকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা। সে অবাক বিস্ময়ে দু চোখ ভরে দেখে, শুধু দেখে!



অবাঙালিদের কড়া বার্তা দেওয়ার সময় এসেছে

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

বাঙালি যেন নিজভূমে পরবাসী। নিজের রাজ্য। সেখানে সে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে না। জেলার দিকে, গ্রামের দিকে যদিও বাংলা বেঁচে আছে, শহর কলকাতা থেকে বাংলা একে-বারেই যেন নির্বাসিত। শুধু ইংলিশ মিডিয়ামকে দোষারোপ করে লাভ নেই। রাস্তায়, দোকানে, ট্যাক্সিতে কতটুকু বাংলা শুনতে পাই?

সবাই এখানে হিন্দিতে কথা বলতেই অভ্যস্ত। এমনকী বাঙালিরাও সেই স্রোতেই গা ভাসিয়েছে। বাংলা না বলাটাই যেন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন আপনার মোবাইলে বিভিন্ন কোম্পানির ফোন আসে। বেশিরভাগই হিন্দিতে। এমন নয় যে তাঁরা দিল্লি বা মুম্বই থেকে করছেন। এই কলকাতার অফিস থেকেই ফোন আসছে। কিন্তু টেলিকলার বাংলা জানে না। বা জানলেও বলবে না।

ট্যাক্সিতে উঠুন। এখানে তো আরও ভয়ঙ্কর। বাঙালি ড্রাইভার কমতে কমতে প্রান্তিক হয়ে এসেছে। যদিও বা কয়েকজন আছেন, তাঁরাও

শুরুই করেন হিন্দি দিয়ে। উত্তর কলকাতায় তবু কিছুটা বাংলা পাবেন। দক্ষিণ কলকাতার বিশেষ কিছু জায়গায় হয়ত পাবেন। বাকি অংশে বাংলা কোথায়? অধিকাংশ দোকানেই আপনাকে হিন্দি শোনার জন্য তৈরি থাকতে হবে। অবাঙালিদের আমরা বাংলা শেখানোর তাগিদই অনুভব করিনি। এই তালিকায় মুসলিমরা যেমন আছেন, তেমনি মারওয়াড়ি, গুজরাটি, বিহারীরাও আছেন। পার্ক সার্কাস, তপসিয়া, তিলজলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, রাজাবাজারে আপনি বাংলা শুনতে পাবেন না। ঠিক তেমনি বড়বাজারে গেলেও পাবেন না। মনে হবে, দোষটা তাদের নয়, আপনার। কারণ আপনি বাংলা জানেন। আপনাকেই তাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে হবে।

যাঁরা কয়েকমাসের জন্য এসেছেন, তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু যাঁরা বহু বছর ধরে এখানে আছেন, যাঁদের এখানেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তাঁরাও বাংলায় কথা বলেন না। বরং আমরা আদিখ্যেতা করে তাঁদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলি। অনেক হয়েছে। এবার এটা বন্ধ হওয়া দরকার। একটা কড়া বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার।



পায়ে হেঁটেই নববর্ষের আড্ডায় হাজির দাদাঠাকুর

কখনও এসে গান ধরেছেন দাদাঠাকুর। কখনও আপন মনে কবিতা বলে চলেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তরুণদের উৎসাহ দিচ্ছেন তারাশঙ্কর। আবার খুব সঙ্কোচে নিজের নতুন লেখার কথা শোনাচ্ছেন শঙ্কর। কখনও হাজির হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তো কখনও আসর জমিয়ে দিচ্ছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরাতনী টপ্পা ধরছেন বুদ্ধদেব গুহ, নীরব শ্রোতা লীলা মজুমদার। নববর্ষ মানেই টুকরো টুকরো এমন নানা মুহূর্ত। নববর্ষ মানেই মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ-এর সেই জমজমাট আড্ডা। দুপুর গড়িয়ে যেত বিকেলের দিকে, সন্ধ্য গড়িয়ে যেত রাতে। এক প্রজন্মের সঙ্গে দিব্যি মিশে যেত আরেক প্রজন্ম। কিন্তু এসব আড্ডার কথা কে আর শোনাবেন! পুরনো মানুষেরা একে একে সবাই প্রায় চলে গেছেন। কিন্তু পুরনো অনেক স্মৃতি আগলে বসে আছেন এক প্রবীণ প্রকাশক।

পোশাকি নাম সবিতেন্দ্রনাথ রায়।
বইপাড়ায় জনপ্রিয় নাম ভানুবাবু।
নববর্ষ মানেই তাঁর দোকানে লেখকদের
জমজমাট আড্ডা। অনেক স্মৃতি
সযত্নে আগলে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে
আলাপচারিতায় স্বরূপ গোস্বামী।

হ্যাঁ, তিনি মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ-এর কর্ণধার সবিতেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশনার জগৎ যাঁকে একডাকে চেনে ভানুবাবু নামে। বয়স আশির গন্ডি ছাড়িয়েছে অনেকদিন। বয়স এখনও সেভাবে থাৰা বসাতে পারেনি স্মৃতিতে। এখনও উঠে পড়েন সাতসকালে। নানারকম বই, ম্যাগাজিন পড়তে থাকেন। নিজের হাতে প্রুফ দেখেন। বারোটা

বাজতে না বাজতেই হাজির হয়ে যান কলেজ স্ট্রিটের মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এ। লেখকরা আসেন, পাঠরাও আসেন। অনেক নতুন পাণ্ডুলিপি পড়তে হয়। সঙ্গে পর্যন্ত সেখানেই কেটে যায়। ফিরে এসেও বসে পড়েন বই নিয়ে। ভদ্রতা বা সৌজন্যে কোনও কার্পণ্য নেই। ফোন করে এক সঙ্গে হাজির হয়েছিলাম তাঁর ঢাকুরিয়ার বাড়িতে। বাড়ি নয়, যেন জীবন্ত এক ইতিহাস। কত কিংবদন্তি সাহিত্যিকের স্মৃতি বিজড়িত সেই ঘর। কথায় কথায় নববর্ষের আড্ডা। কখনও নববর্ষকে ছাপিয়ে উঠে এল প্রকাশনা জগতের অনেক অজানা কথা। সেই আলাপচারিতার কিছুটা নির্যাস বরং তুলে ধরা যাক।

প্রশ্নঃ বাংলা নববর্ষ মানেই তো আপনার দোকানের সেই জমজমাট আড্ডা।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, দেখতে দেখতে সেই আড্ডার বয়স সাতষট্টি বছর হয়ে গেল। মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এর পথ চলা শুরু ১৯৩৪-এ। খুব অল্প বয়সেই আমি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। তবে নববর্ষের আড্ডা বলতে যা বোঝায়, তা শুরু হয় ১৯৪৯ নাগাদ। তখন থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যিকরা আসতেন। যত দিন গেল, সেই আড্ডার কথা ছড়িয়ে গেল। সেই সময়ের অধিকাংশ বড় বড় লেখকই একবার না একবার টুঁ মেরে যেতেন সেই আড্ডায়। তবে পয়লা বৈশাখ খুব ভোরেই যাই দক্ষিণেশ্বরে পূজো দিতে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে বারোটা নাগাদ যাই দোকানে। তখন থেকেই সাহিত্যিকদের আসা যাওয়া শুরু। একেক সময় একেকজন আসতেন। আড্ডা চলত রাত নটা-দশটা পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ সেই আড্ডায় নাকি দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র

পন্ডিতও আসতেন। তিনি আসা মানেই অনেক মজার মজার ঘটনা। সেগুলো মনে পড়ছে ?

ভানুবাবুঃ দাদাঠাকুর মানেই এক বর্ণময় চরিত্র। তিনি বেশ কয়েকবার এসেছেন এই আড্ডায়। আর তিনি থাকা মানে তিনিই হয়ে উঠতেন মধ্যমণি। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার ব্র্যাবোর্ন রোডে তাঁর সঙ্গে দেখা। বললাম, যাবেন না ? বললেন, হ্যাঁ, তোদের ওখানে তো একবার যেতেই হবে। আমি বললাম, দাঁড়ান, একটা ট্যান্ডি ডেকে আনি। উনি বললেন, ‘ট্যান্ডি দরকার নেই। দাঁ আছে দুটো, কুড়ুল আছে একটা। কাটতে কাটতে চলে যাব।’ দাঁ-কুড়ুল মানে বুঝলাম না। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, ওরে, আমার নামের শুরুতেই দাদা, অর্থাৎ দুটো দাঁ। আর ঠাকুরকে একটু উল্টে-পাল্টে দিলেই কুঠার হয়ে যাবে। পায়ে হেঁটেই চলে এলেন। এসে একাই জমিয়ে দিলেন। গান ধরলেন কলকাতা ভুলে ভরা। আড্ডায় সজনীকান্ত দাসও হাজির। তিনি দাদাঠাকুরকে বললেন, ‘দাদাঠাকুর, কোথায় যাবেন, বলুন। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে ছেড়ে দেব।’ দাদাঠাকুর বললেন, ‘সারা জীবনে অনেক পাপ করেছি, আমাকে গাড়ি চাপিয়ে একটু পুণ্য সঞ্চয় কর।’ সজনীকান্ত বললেন, কেন, কী পাপ করেছি ? দাদাঠাকুর বললেন, ‘কত নিপাতনে সিদ্ধ লেখককে মেরে ফেলেছি। দিকপাল সব লেখককে কত গালমন্দ করেছি। এটা পাপ নয় !’

প্রশ্নঃ আর কারা আসতেন ?

ভানুবাবুঃ কাকে ছেড়ে কার কথা বলব ?

তারাক্ষর থেকে নীহাররঞ্জন গুপ্ত। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত থেকে প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত

দাস, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শঙ্কর, নিমাই ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত সরকার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার। এখনও সেই আড্ডা বসে। এখন এই প্রজন্মের লেখকরা আসে। ভগীরথ মিশ্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী বসু, প্রচৈত গুপ্তরা একবার না একবার ঠিক আসে। বুদ্ধদেব গুহ নিয়মিত আসতেন। পুরাতনী টপ্পা গাইতেন। কিন্তু স্ত্রী ঋতু গুহ মারা যাওয়ার পর থেকে আসেননি। কেউ প্রবীণ, কেউ আবার তখন সবে সাহিত্য জগতে পা রেখেছেন। নবীন-প্রবীণ মিলে যেত ওই একটা দিনে।

প্রশ্নঃ শুধু লেখকরা ? অন্য জগতের লোকেরা আসতেন না ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, তাও আসতেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। সবাই গান গাওয়ার আবদার করল। হেমন্তবাবু বললেন, গান করতে তো আসিনি। এসেছি গজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সবাই মিলে কত আড্ডা হচ্ছে, এই তো ভাল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রতিবারই আসতেন। তিনি থাকলে যা হয় ! একাই আসর জমিয়ে দিতেন। একবার ভানু বাবু একটা বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন। আমি বললাম, কাউন্টারে যাবেন নাকি ! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বই কিনব ? ক্ষেপেছিস ? আমাকে বই কিনতে দেখলেই লোকজন গালাগাল দেবে। বলবে, এই দেখ, শালা ভানুও বই পড়ছে। উত্তম কুমার বই পড়লে ক্ষতি নেই। আমি বই পড়লেই যত দোষ। যেন আমার বই পড়ারও যোগ্যতা নেই।' একবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়ে এক সমস্যা। বীরেনবাবুর সঙ্গে ছিলেন দেবনারায়ণ

গুপ্ত। তিনি এসেই বললেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অভদ্র। এক ট্রামে একসঙ্গে এলাম। কোনও কথাই বলল না। যা জিজ্ঞেস করলাম, শুধু হুঁ হুঁ করে গেল। এ কেমন ভদ্রতা ? তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'মুখ খুলে কি বিপদ বাড়াব ? মুখ খুললেই তো আওয়াজ শুনে লোকে বুঝে যেত, বীরেন্দ্র ভদ্র যাচ্ছে। এরকম নানা টুকরো টুকরো ঘটনা। সব একসঙ্গে মনেও পড়ে না।

প্রশ্নঃ সেদিন এত লেখককে সামাল দিতেন কী করে ? সবাই কি মাটিতেই বসতেন ?

ভানুবাবুঃ দোকানে বসার জায়গা কোথায় ? দোকান তো বইয়ে ঠাসা। পয়লা বৈশাখ বিক্রি একটু বেশি হয়। ফলে, আরও বেশি বই রাখতে হত। এর মাঝে আলাদা করে বসার আয়োজন করা মুশকিল হয়ে যেত। তারই মাঝে কিছু চেয়ার, কিছু টুল থাকত। অনেকে মাটিতেও বসতেন। তাছাড়া, সবাই তো একসঙ্গে থাকতেন না। কেউ হয়ত দুপুরে এসে ঘণ্টাখানেক থেকে চলে যেতেন। কেউ আসতেন বিকেলের দিকে। সবমিলিয়ে কুলিয়ে যেত। সমস্যা হত না। আসলে, কে টুলে বসলেন, কে বইয়ের উপরে বসলেন, এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাতেন না। সবাই একসঙ্গে হই হুল্লোড় করতেন, সেটাই আসল কথা।

প্রশ্নঃ নিশ্চয় খাওয়া দাওয়ার আয়োজন থাকত। লেখকদের কী উপহার দিতেন ?

ভানু বাবুঃ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যেত খাওয়া দাওয়ার পর্ব। সারাক্ষণই চলত। কখনও মিষ্টি, কখনও নোনতা। আলুর দম, ফুচকা, চুরমুর, সব ব্যবস্থাই থাকত। আর দফায় দফায় চা, কফি, শরবত তো আছেই। কেউ ভোজনরসিক,

তিনি হয়ত একটু বেশি খেলেন। কেউ বাড়ি থেকে খেয়ে আসতেন। তিনি দু একটা মিষ্টি মুখে তুলতেন। কেউ প্যাকেটে করে বাড়ি নিয়ে যেতেন। সবমিলিয়ে একটা উৎসবের পরিবেশ থাকে। লেখকদের নানারকম উপহার দেওয়া হয়। দামি পেন, ফোল্ডার, বই তো থাকেই। বিভিন্ন বছরে নানারকম উপহার। তবে উপহার যা দেওয়া হবে, সবাইকে একইরকম। বই দেওয়া হলে, সবাইকে একইরকম বই দেওয়া হয়। তবে জীবিত লেখকদের বই সাধারণত দেওয়া হয় না। এক লেখকের বই দেওয়া হলে অন্য লেখকের খারাপ লাগতে পারে। তাই মৃত লেখকদের বইই দেওয়া হয়। একবছর দিয়েছিলাম ‘খেয়ালখুশির খাতা।’

প্রশ্নঃ খেয়াল খুশির খাতা! সেটা আবার কার লেখা ?

ভানুবাবুঃ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখকরা এসে একটা খাতায় যা খুশি লিখে রাখতেন। নানা মজার মজার মন্তব্য। সমস্ত দিকপাল সাহিত্যিকদের নানা মজার কথা আছে এই খাতায়। একটা ঐতিহাসিক দলিলও বলতে পারেন। সেই মন্তব্য গুলোই দু বছর আগে বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। সাহিত্যের অনেক অজানা দিক সেখানে আছে।

প্রশ্নঃ শুনেছি, পয়লা বৈশাখ নাকি লেখকদের সম্মান দক্ষিণাও দেওয়া হয়। আপনার এখানেও কি সেই ট্রাডিশন আছে ?

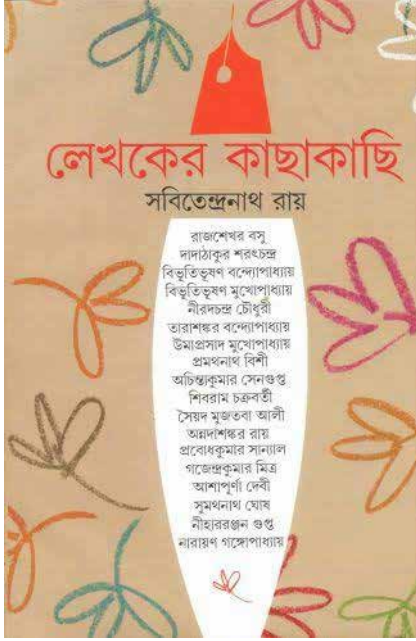
ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, এই ট্রাডিশনটা অনেকদিনের পুরানো। পয়লা বৈশাখ লেখকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়। তবে সবসময় পুরোটা দিতে পারি না। চেষ্টা করি, ওই দিন অন্তত কিছুটা দেওয়ার।



সবার পাওনা সমান হয় না। কারও হয়ত পাঁচটা বই আছে, কারও একটা। কারও নতুন বই নেই, কিন্তু পুরানো বই বাবদ রয়্যালটি আছে। তাই সবার টাকার অঙ্কটা সমান হয় না। যার যেমন পাওনা, সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদা খাম তৈরি থাকে।

প্রশ্নঃ ওই দিন কি বইয়ে উদ্বোধনও হয় ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, অনেক লেখক ওই দিন বই প্রকাশ করতে চান। তবে এখন আর ঘটা করে উদ্বোধন করি না। এর একটা কারণ আছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বইটার কথা নিশ্চয় শুনেছেন। ওই বইটা পয়লা বৈশাখ বেরিয়েছিল। দাম ছিল কুড়ি টাকা। সেদিন বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। বই কেনার জন্য এমন ছড়োছড়ি, সামাল দেওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিনে দশ হাজার কপি শেষ। কলেজ স্ট্রিটের অন্য প্রকাশকদের ব্যবসা সেদিন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে আর ঘটা করে উদ্বোধন হয় না। তবে ওই দিন পাঠকদের মধ্যেও বই কেনার একটা বাড়তি তাগিদ থাকে। অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা



ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। তার থেকেও বড় আকর্ষণ, ওই দিন দোকানে এলে লেখকদের হাতের কাছে পাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়। তাঁদের দিয়ে বইয়ে সই করিয়ে নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ সেদিনের পয়লা বৈশাখ আর এদিনের পয়লা বৈশাখ। তফাতটা কোথায়? সেই জৌলুস কি আর আছে?

ভানুবাবুঃ সবকিছুতেই তো জৌলুস কমছে। পয়লা বৈশাখের আড্ডাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখনও আড্ডা হয়। এই সময়ের অনেক লেখক আসেন। কিন্তু সেই প্রাণটা যেন থাকে না। আসলে, এখন সবাই বড় ব্যস্ত। আগে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক নতুন লেখকদের লেখা পড়তেন। উৎসাহ দিতেন। এখন সেই পড়ার আগ্রহ দেখি না। একজন

আরেকজনের লেখা না পড়লে সেই একাত্মতা আসে না। সেই বর্নময় চরিত্রও নেই। সেই আড্ডা দেওয়ার অবসরও নেই। আগে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হত। এখন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়।

প্রশ্নঃ এখনকার লেখকরা তাহলে পড়ছেন না!
ভানুবাবুঃ সবার সম্পর্কে এমনটা বলা হয়ত ঠিক হবে না। কিন্তু সার্বিকভাবে বলতে গেলে, পড়ার আগ্রহটা সত্যিই কমেছে। ভাল লেখা না পড়লে নিজের লেখাও সমৃদ্ধ হবে না। জীবনকে আরও গভীরভাবে দেখতে হয়। যে বিষয়টি নিয়ে লিখছেন, সেটি আরও ভালভাবে জানতে হয়। এই জানার চেষ্টাটাই অনেকের মধ্যে দেখি না। কিন্তু একজনের নাম বলতেই হবে, সমরেশ মজুমদার। ও কিন্তু কোনও বিষয়ে লেখার আগে সেটা ভালভাবে জেনে নেয়। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ওর কোনও সঙ্কোচ নেই। মাঝে মাঝেই ও ফোন করে অনেককিছু জানতে চায়। যেটা জানি, সেটা বলি। অন্যদের কাছেও জানতে চায়। কিন্তু এই অভ্যেসটা বাকিদের মধ্যে দেখি না। তারা হয়ত ভাবে, কিছু জানতে গেলে হয়ত ছোট হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ শুনেছি, প্রকাশকদের নাকি লেখকদের থেকেও অনেক বেশি পড়তে হয়।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, লেখকদের না পড়লেও চলে। কিন্তু প্রকাশককে পড়তেই হয়। তার কোনও ফাঁকিবাজি চলবে না। বইয়ের পান্ডুলিপি পড়েই বুঝতে হয়, এই বই চলবে কিনা। চললে, কখন চলবে। শুধু লেখকের নামে তো বই কাটে না। ভাল বিষয়ও থাকতে হয়। আবার অনামী লেখকের ভাল বইও অনেক সময় মানুষের কাছে পৌঁছয় না।

প্রশ্নঃ এখন যদি কোনও লেখকের উপর বাজি ধরতে হয়, কার উপর ধরবেন ?

ভানুবাবুঃ প্রথমেই সমরেশ মজুমদার। লেখার একটা অদ্ভুত বাঁধুনি আছে। বিষয়টাকে ভালভাবে জেনে, তারপর লেখে। যা লেখে, সবাই বুঝতে পারে। এরপর নবনীতা দেবসেন। ওর লেখার মধ্যে অদ্ভুত একটা ভ্যারিয়েশন আছে। সব ধরনের লেখাই লিখতে পারে। আর এই সময়ের লেখকদের মধ্যে বেছে নেব প্রচেষ্টা গুপ্তকে। ওর গল্প বলার কায়দাটা ভারী অদ্ভুত। অনেক ছোটখাটো বিষয়কেও লেখার গুনে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। এমন একটা আকর্ষণ আছে, যা আপনাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ প্রকাশকের পাশাপাশি আপনি নিজেও তো একজন লেখক। কিন্তু লোকে বলে, অনেক দেরিতে কলম ধরলেন। এর জন্য আফসোস হয় না ?

ভানুবাবুঃ সে অর্থে আমি লেখক নই। আমি মূলত একজন প্রকাশক। লেখকদের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছু শিখেছি। দোকানে অনেক দিকপাল মানুষ আসতেন। কবিশেখর কালিদাস রায় বলে- ছিলেন, ‘এখানে যা আলোচনা হয়, তা লিখলেই একটা ভাল বই হয়ে যায়।’ কিন্তু আমি তো আর লেখক নই। তবু যে সব ঘটনা মনে দাগ কাটত, নোট করে রাখতাম। সেইসব স্মৃতি নিয়ে লিখেছিলাম ‘কলেজ স্ট্রিটে সন্তোর বছর’। এটা আমার আত্ম-কথাই বলতে পারেন। এই বই পড়লে লেখকদের অনেক কথা জানতে পারবেন। পরে অনেকে বলল, বিভিন্ন লেখকদের সঙ্গে স্মৃতিকথা তুলে ধরতে। তখন লিখলাম, ‘লেখকের কাছাকাছি’।

প্রশ্নঃ কোন বই কেমন চলবে, আগাম বুঝতে পারেন ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, পারি। অভিজ্ঞতা থেকেই পারি। এর জন্য নিজেকে পাঠক হতে হয়, পাঠকের পালস বুঝতে হয়। কোনও বই হয়ত শুরুতে তেমন ছাপ ফেলে না। কিন্তু যত দিন যায়, কদর বাড়ে। সেটাও আগাম বুঝতে হয়। আবার কোনও বই শুরুতে দারুণ বিক্রি হলেও পরের দিকে থেমে যায়। পাঠকদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করি। সবমিলিয়ে একটা পালস বুঝতে পারি।

প্রশ্নঃ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েও, এই বয়সেও নিজেই নাকি প্রুফ দেখেন।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, তা দেখতে হয়। সব না হলেও কিছু তো দেখতেই হয়। লেখকরাও সবসময় প্রুফ দেখতে পারেন না। বড় লেখক হলেই নির্ভুল বানান লিখবেন, এমনটা সচরাচর হয় না। কাজটাকে ভালবাসি তো, তাই যত্ন নিয়েই করি। চেষ্টা করি, যতটা সম্ভব, নির্ভুল ছাপতে। কোথাও কোনও বানান ভুল থাকলে কষ্ট হয়। তাই, এই বয়সেও যতটা পারি, চেষ্টা করি।

(লেখাটি তিন বছর আগে পয়লা বৈশাখ বেঙ্গল টাইমসেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই পয়লা বৈশাখ আবার ছাপা হল। সাক্ষাৎকারটি এখনও একইরকম প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য ও প্রকাশনা জগতের অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে এই সাক্ষাৎকারে।)

ওপেন ফোরাম

আর 'ভাইপো' নয়, এবার 'ভাগ্নে' বলার সময় এসেছে

রঞ্জিত মিত্র

মাস পাঁচেক আগের কথা। তখন ডিসেম্বর মাস। ইংরাজি বছর শেষ হয়ে নতুন বছর আসার কথা। শুভেন্দু অধিকারী হুঙ্কার দিয়ে বসলেন, ডিসেম্বরেই বড় ধামাকা। কী সেই ধামাকা? সরাসরি না বললেও ইঙ্গিতটা ছিল পরিষ্কার, এবার বড় মাথা ধরা পড়তে চলেছে।

দিন যায়, মাস যায়। দেখা গেল, কার্যত কিছুই হল না। পর্বতের মূষিক প্রসব বলতে যা বোঝায়, সেটুকুও নয়। নাকের বদলে নরুণও নয়। ডিসেম্বর থেকে ধামাকা সিফ্ট হয়ে গেল জানুয়ারিতে। জানুয়ারিতে কিছু একটা হবে। জানুয়ারি গড়িয়ে গেল ফেব্রুয়ারিতে। এভাবেই এসে গেল মার্চ-এপ্রিল। সার কথাটা জানিয়ে

দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআই-ইডিকে চড়া ভর্ৎসনা করে বলেছেন, আপনারা দুর্নীতির মাথা তো দূরের কথা, কোমর পর্যন্তও পৌঁছতে পারেননি। দু একটা খুচরো এজেন্ট ধরে ভেবে নিচ্ছেন, অনেক কিছু করেছে। টাকা কার কাছে পৌঁছত, তা নিয়ে কিছুই করতে পারেননি।

বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে দেখে কিছুটা করুণাই হয়। তাঁরা আন্তরিকভাবেই চান, সিবিআই জোরদার তদন্ত করুক। একে-তাকে জেলে ভরুক। তাহলেই কেপ্লা ফতে। কিন্তু দিল্লির কাছে তাঁরা যে নেহাতই ছাগলের তৃতীয় সন্তান, এটুকু তাঁরা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না। সবার সন্দেহের তীর যাঁর দিকে, তিনি এখনও কী অবলীলায় হুঙ্কার ঝেড়ে চলেছেন। কখনও বলছেন, একলাখ লোক নিয়ে দিল্লিতে ধর্না দেব। কখনও বলছেন, সিবিআই-ইডি আমার কাঁচকলা করবে। কখনও বলছেন, আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ দেখিয়ে দিন।





মাঝে মাঝেই প্রশ্ন ওঠে, এই স্পর্ধা আসে কোথেকে? হয় সততা থেকে, নইলে উচ্চস্তরের বোঝাপড়া থেকে। প্রথমটা তাঁর সম্পর্কে একেবারেই খাটে না। তিনি সৎ, একথা শুনলে তৃণমূলের লোক সবথেকে বেশি হাসবে। খোদ তৃণমূলে এমন একজনকে পাওয়া যাবে না, যিনি মনে করেন এই মানুষটি সৎ। কোনও ব্যামকেশ-ফেলুদার দরকার নেই। কোনও সিবিআই-ইডিরও দরকার নেই। সাদা চোখে যা দেখা যায়, সেটাই যথেষ্ট। তিনি পাকা খেলোয়াড়, তাঁকে বুদ্ধি দেওয়ার ধুরন্ধর সব মাথা আছে, এটাও ঠিক। বড় বড় আমলা আছেন তাঁকে সুরক্ষা দিতে, বড় বড় অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছেন, দুর্নীতিকে আরও মসৃণ পথে পরিচালনার জন্য। কিন্তু তারপরেও অনেক ফাঁক থেকে গেছে। যা একেবারে সাদা চোখেই নগ্নভাবে ধরা পড়ে। তাঁর ঘোষিত সাগরেদদের কাণ্ড কারখানা দেখেই বোঝা যায়, নাটের গুরুটি কেমন হতে পারেন।

কিন্তু এত কিছু পরেও তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। তিনি গলা উঁচু করে হুক্কার বেড়ে যান। কারণ, তিনি জানেন, রাখে হরি মারে কে! এই হরিটা কে বলুন তো! রাজ্যের পুলিশ বা প্রশাসন কার্যত তাঁর ভৃত্যসম। ফলে, তাঁদেরকে ঘিরে কোনও আশঙ্কা না থাকারই কথা। কিন্তু যাঁদের ঘিরে আশঙ্কা থাকার কথা, তাঁদের ঘিরেও আশঙ্কা নেই। কারণ, জানেন, তাঁদের টাঁকিটা কোথায় বাঁধা। তিনি জানেন, বঙ্গ বিজেপি যতই লক্ষ্যবস্তু করুক, দিল্লিতে মোদি মামা, অমিত মামা আছেন। চিন্তার কিছু নেই। মাথায় কার স্নেহের হাত, কার প্রশ্রয়ের হাত রয়েছে, শুভেন্দু অ্যান্ড কোং কি এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না!

তাই আর তাঁকে ভাইপো ভাইপো বলে ডাকার কোনও মানে হয় না। ভাইপো হয়ে রাজ্যের গন্ডিতে সুরক্ষিত থাকা যায়, মাতবুরি করা যায়। কিন্তু ‘ভাইপো’ তকমাটা সিবিআইয়ের কাছে বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়। সেখানে আরও প্রভাবশালী কারও ‘ভাগ্নে’ হতে হয়। কাজেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁকে ‘ভাগ্নে’ বলা যায় কিনা, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভেবে দেখতে পারেন।

বামেরাও ভেবে দেখতে পারেন। ‘সেটিং’ শব্দটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। এবার ‘ভাগ্নে’ শব্দটাকে বাজারে আনা যায় কিনা ভেবে দেখুন।

ফিরে দেখা

গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলাপ ওই তিনমাসেই

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

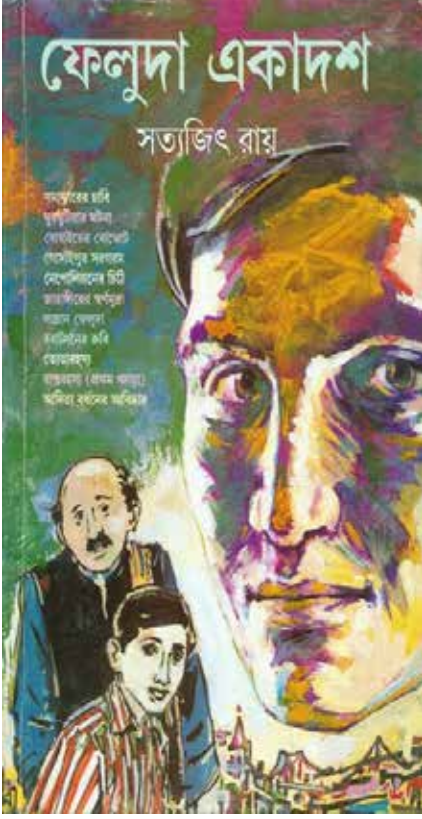
ছোটবেলা থেকেই পড়তাম, ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস। যতবার পড়তাম, ততবারই মন খারাপ হত। আমরা কি সত্যিই স্বাধীন? রোজ স্কুলে যেতে হয়, টিউশনি যেতে হয়, বেশিক্ষণ খেলাধুলা করা যায় না। সাঁতার কাটা যায় না। সন্দের আগেই বাড়ি ফিরতে হয়। যখনই টিভিতে খেলা দেখতাম, বাড়ির লোকজন বলত, সামনে পরীক্ষা, এখন টিভি দেখছিস? বড় হ, তারপর যতখুশি দেখবি।

এসব শুনতে শুনতেই বেড়ে ওঠা। যত দিন গেল, তত যেন চাপ বাড়তে লাগল। একটা টিউশনি থেকে দুটো হল। আরও নতুন নতুন সাবজেক্ট, মোটা মোটা বই। খেলার সময়, টিভি দেখার সময় যেন আরও কমে গেল। মনে হত, কবে মাধ্যমিকটা শেষ হবে। তারপর আমাকে

পায় কে? নাইন থেকেই মনে হত, মাধ্যমিক শেষ হলে আমার স্বাধীনতা দিবস শুরু হবে। যেদিন মাধ্যমিক শেষ হবে, সেদিন হবে আমার স্বাধীনতা দিবস। পরীক্ষার সূচি ঘোষণা হল। লোকে জানতে চায়, পরীক্ষা কবে থেকে শুরু। আমি শুরুতেই জানতে চেয়েছিলাম, কবে শেষ। যতদূর মনে পড়ছে, শেষ দিনটা ছিল অঙ্ক পরীক্ষা। আগের পরীক্ষাগুলো তেমন ভাল না হলেও অঙ্কটা বেশ ভালই হয়েছিল। ব্যাস, আমাকে আর পায় কে?

কিন্তু মুশকিলটা হল, ততদিনে প্রায় গরম পড়ে গেছে। ক্রিকেট খেলা বন্ধ। আমি খেলতে চাইলেই খেলব কার সঙ্গে। পাড়ায় অনেকের তখন সামনে উচ্চ মাধ্যমিক। কারও বা ক্লাস





ইলেভেনের পরীক্ষা। কেউ আবার ক্লাস নাইন। তার বাড়ি থেকে ছাড়বে না। এদিকে, আমার পাড়ায় মাধ্যমিক দেওয়া বন্ধু তেমন নেই। কয়েকদিনের জন্য চলে গেলাম মামার বাড়ি। নদীতে ঝাঁপ দেব, সে উপায় নেই। কারণ, তখন এক হাঁটুও জল নেই। পুকুর শুকিয়ে গেছে। বর্ষা আসতে তখনও ঢের দেরি। কী যে করি! বাড়ি ফিরে এসে লাইব্রেরি যাওয়া শুরু করলাম। মনে হল, এই সুযোগে গল্পের বইগুলো পড়ে ফেলা যাক।

আগে গল্পের বই পড়লে সবাই খুব বকাবকি করত। এবার নিশ্চয় বকবে না। কিন্তু কী পড়ব? ওই সময় গোয়েন্দা গল্পের দিকে ঝোঁকটাই বেশি ছিল। কাকাবাবু, ফেলুদা আগেই কিছু পড়া ছিল। বাকিগুলোও পড়ে ফেললাম। এবার হাত দিলাম সার্লোকহোমসে। ইংরাজি নয়, বাংলায়। সেটাও নিম্নে শেষ। হাত দিলাম শেকসপীয়ারে। সেগুলোও এক এক করে শেষ। এক স্যার বললেন, সে কী, বাংলা বইগুলো কবে পড়বি? একজন বলল, রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করতে। একটা বই তুললাম। শেষ করতে পারিনি। ভাল লাগেনি। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা তুললাম। তাও মন ভরল না। বরং শরৎচন্দ্র ওই বয়সেই মনে কিছুটা দাগ কেটেছিল। আবার ফিরে এলাম সেই গোয়েন্দা গল্পে।

দেখতে দেখতে কখন যে তিন মাস পেরিয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। কোথাও যাওয়াও হল না। তবে ওই তিন মাস যা পড়েছিলাম, বাকি জীবনে এমন তিনমাস আর কখনও আসেনি। তাই একইসঙ্গে পড়ার বই থেকে মুক্তির তিন মাস। আবার গল্পের বইয়ে ডুবে যাওয়া তিন মাস। এভাবেই কেটেছিল আমার স্বাধীনতার দিনগুলো।

(বেঙ্গল টাইমসের ফিচার— মাধ্যমিকের পরে। কীভাবে কেটেছিল সেই তিনটে মাস। তা নিয়ে লিখতে পারেন আপনিও। পুরনো দিনগুলোকে একটু ফিরে দেখা। লেখা পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com



স্নেহা সেন

বড় পর্দার গোয়েন্দা গল্প উঠে এসেছে ছোট পর্দায়। ফেলুদা থেকে ব্যোমকেশ, প্রায় সবাই সেই দলে। কিন্তু ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দায় উত্তরণ সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের একেনবাবু সব ব্যাপারেই যেন ব্যতিক্রম।

সেই কতকাল আগে থেকে সুদূর আমেরিকায় বসে সূজন দাশগুপ্ত লিখে চলেছিলেন একেনবাবুর নানা কাহিনী। কিন্তু আমবাঙালির কাছে সেভাবে পৌঁছয়নি। যেই সেটাকে নিয়ে ওয়েব সিরিজ হল, বাঙালি একটু একটু করে চিনতে শুরু করল একেনবাবুকে। ছোট পর্দার হাত ধরে এবার বড় পর্দায় উত্তরণ। দার্জিলিংয়ের পটভূমি ছেড়ে এবার রাজস্থানের মরুভূমিতে। এবারও বেশ জমজমাট।

পাহাড় আর মরুভূমির যাত্রার মাঝে একটা মন-কেমন করা ঘটনা। এতদিন কার্যত আড়ালে থাকা শ্রী সূজন দাশগুপ্ত চলে গেছেন না ফেরার দেশে। কিন্তু তারপরেও একেনবাবুর জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। পরিচালক জয়দীপ চক্রবর্তী আর চিত্রনাট্যকার পদ্মনাভ দাশগুপ্তর বুদ্ধিদীপ্ত চেষ্টা বেশ প্রাণবন্তই রেখেছে একেনবাবুকে। আর অনির্বাণ চক্রবর্তীর কথা না বললেই নয়। একেনবাবু বললেই সবার আগে যে তাঁর মুখটাই মনে পড়ে যায়।

একেনবাবু মানে, আপাতঅর্থে একটা সহজ, সরল, বোকা লোক। লোকে তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। তিনি যে গোয়েন্দা, এটা কেউ

রাজস্থানেও
দিব্য উতরে
গেলেন
একেনবাবু



মনেই করে না। পাত্তাই দেয় না। কিন্তু শেষবেলায় এসে দেখা যায়, তিনি কিস্তিমাত করে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ‘রুদ্দাশাস রাজস্থান’ এ পটভূমি কিছুটা যেন অন্যরকম। এখানে তাঁর গোয়েন্দা সত্তাকে মোটামুটি সবাই গুরুত্ব দিচ্ছে। এমনকী দুই সঙ্গীও এবার তাঁকে বেশ সমীহ করছে। মাঝপথেই বলে ফেলছে, ‘লোকটার কী অবজার্ভেশান দেখেছিস!’

ফেলুদা রাজস্থানে গিয়েছিল সোনার কেব্লার সন্ধানে। একেনবাবু অবশ্য নিছকই বেড়াতে। কিন্তু যা হয়! টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ঠিক তেমনই গোয়েন্দা নির্ভেজাল বেড়াতে গেলেও কিছু না কিছু ঘটেই যায়। তাঁকে জড়িয়ে যেতেই হয়। মাঝখান থেকে বেড়ানোটাই মাটি। এক্ষেত্রেও যোধপুর থেকে সোজা সোনার কেব্লা। মাঝে কোনও রহস্যের গন্ধ নেই। কিন্তু জয়সলমিরে যেতেই বিভ্রাট। প্রথমে এক অধ্যাপক আক্রান্ত। মূর্তি চুরির র্যাকেট। অনুষঙ্গ হিসেবে গোটা দুই খুন।

সোনার কেব্লার সঙ্গে নানা জায়গায় ছত্রে ছত্রে মিল। এই মিলটা অবশ্য সচেতনভাবেই রাখা হয়েছে। একেনবাবু যেন একইসঙ্গে জটায়ু আর ফেলুদা। একদিকে কমিক রিলিফ দিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে রহস্যের জট ছাড়াচ্ছেন। সেই সোনার কেব্লা, সেই উটে চড়া, সেই রাজস্থানী লোকসঙ্গীত, সেই সার্কিট হাউস। পরতে পরতে সেই আমেজ আনার চেষ্টা। ডক্টর হাজরা, মন্দার বোস নামগুলোও এসেছে

ঘুরেফিরে। আর স্বয়ং সত্যজিৎ তো আছেনই। এও একধরনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। এক স্রষ্টার প্রতি আরেক স্রষ্টার।

অক্সফোর্ডের প্রফেসর হিসেবে আসা রজতাভ শুরু থেকেই ছিলেন সন্দেহের তালিকায়। মনে হচ্ছিল, এই লোকটাই বোধ হয় সেই ‘দুই লোক’। তিনিই হয়ত মূর্তি পাচার চক্রের পান্ডা। পরে দেখা গেল, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া। হাতের কাছেই আছে আসল পান্ডা। তিনিও এক অধ্যাপক, তবে আর্কিওলজির নয়, রসায়নের। সেই সুবাদে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিঞ্চিৎ কেমিস্ট্রিও। আবহসঙ্গীতগুলো কেমন যেন বেমানান। এত লক্ষ্যবাম্পের কী দরকার! কোথাও কোথাও যেন একটু বেশিই জট পাকানো হয়েছে। একটু বেশিই সাসপেন্স ও থ্রিলার আনার চেষ্টা হয়েছে। বেচারা একেনবাবু নিরীহ, গোবেচারামানুষ। তাঁকে দিয়ে এমন টিসুম-ঢাসুম না করলেই চলছিল না!

খোলা চিঠি

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় একটি বিভাগ — খোলা চিঠি। একটা সময় নিয়মিত প্রকাশিত হত। নানা জগতের দিকপালদের লেখা হত এই খোলা চিঠি। কোনওটা অভিনন্দনের, কোনওটা তীব্র সমালোচনার। লিখতেন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পাঠকরা।

মাঝে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। ই ম্যাগাজিনে আবার সেই খোলা চিঠিকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। চেষ্টা থাকবে প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি করে খোলা চিঠি প্রকাশ করার। এই চিঠি মূলত সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যুকে নিয়েই। রাজনীতি, সাহিত্য, খেলা, বিনোদন—সহ যে কোনও জগতের মানুষকেই লেখা যেতে পারে এই খোলা চিঠি। লিখবেন আপনারা।

লেখার শব্দ সংখ্যা আনুমানিক ৫০০ থেকে ৮০০।

পিডিএফ নয়, ইউনিকোডে পাঠান।

নির্বাচিত কিছু চিঠি নিয়ে আলাদা সংখ্যাও হতে পারে।

লিখে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

মিডিয়া সমাচার

এক মিডিয়ার কথা অন্য মিডিয়ায় সচরাচর আলোচনা হয় না। কিন্তু বেঙ্গল টাইমসে বেশ কয়েকবছর ধরেই মিডিয়া জগতের নানা অজানা দিক উঠে আসে।

একজন অভিনেতা বা খেলোয়াড় বা সাহিত্যিক যদি পারফরমার হয়ে থাকেন, তবে একজন সাংবাদিকও পারফরমার। কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও ক্লাব নিয়ে যদি আলোচনা হয়, তাহলে কাগজ বা চ্যানেলও একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের নিয়েও আলোচনা হতে পারে। প্রাণ খুলে প্রশংসাও করতে পারেন। আবার ভাল না লাগলে সমালোচনাও করতে পারেন।

মিডিয়া মানে এখন আর শুধু কাগজ বা টিভি চ্যানেল নয়। গণমাধ্যমের সুবিশাল পরিসরে সোশ্যাল মিডিয়াও ঢুক পড়েছে।

কোনও চ্যানেলের দারুণ কোনও অনুষ্ঠান নিয়ে আলোকপাত হতে পারে। কোনও ভাল ইউটিউব চ্যানেল ও তার কনটেন্ট নিয়েও আলোকপাত হতে পারে। ফেসবুকের কোনও ভাল গ্রুপ নিয়েও চর্চা চলতে পারে। আপনার অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে ভাগ করে নিতেই পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

বাংলাস্ফিয়ারের নদী বইতে থাকুক

হরিশ মুখার্জি

দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল। একটা ইউটিউব চ্যানেলেরও এক বছর পথ চলা মানে খুব সহজ ব্যাপার নয়। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ইউটিউব চ্যানেল এল। আবার নিঃশব্দে হারিয়েও গেল। শুরুতে অনেকে ভেবে নেন, ইউটিউব চ্যানেল মানেই বোধ হয় প্রচুর রেভিনিউ। কিন্তু এই মোহটা ভাঙতে সময় লাগে না। ঠিকঠাক কনটেন্ট দেওয়া, ধারাবাহিক-ভাবে লেগে থাকা, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ঠিকঠাক প্রোমোট করা। এই তিনের মেলবন্ধন না থাকলেই একসময় উৎসাহ হারিয়ে যায়। মাঝপথেই পথ চলা থমকে যায়।

এখানে যে ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে আলোচনা, তা হল বাংলাস্ফিয়ার। বিরাট কিছু সাবস্ক্রাই-

ইবার নেই। এখনও দশ হাজার অতিক্রম করেনি। পরিসংখ্যান বলছে, মোট ভিডিওর সংখ্যা ২২০। কোনওটির ভিউয়ার এক হাজার, কোনওটির দেড় হাজার। কোনওটির তিন হাজার। এই হল পরিসংখ্যান। কিন্তু সেই কোনকাল আগে নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন, স্কোরবোর্ড হল একটি গাধা। সে আসলে কিছুই বলে না। ইউটিউবের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। সাবস্ক্রাইবার দিয়ে বা ভিউয়ার দিয়ে কতটুকুই বা বোঝা যায়। লাইক বা কমেন্ট দেখেও আসলে কিছুই বোঝা যায় না। বুঝতে হয় সেই নদীতে নেমে, বুঝতে হয় আরও গভীরে গিয়ে।

চটকদারি জিনিসে প্রাথমিক ভিউয়ার অনেক বেশি। কিন্তু একসময় চালাকিটা ধরা পড়ে যায়। এই চ্যানেলের দর্শক-শ্রোতাদের ক্লাস একটু অন্যরকম। তাঁদের খিদেটাও অন্য



রকমের। এক-দুটো এপিসোড হয়ত অনেকে দেখেছেন। যাঁদের ভাল লেগেছে, তাঁরা টিকে আছেন। যাঁদের ভাল লাগেনি, তাঁরা হারিয়েও গেছেন। আসলে, আর দশজন স্বঘোষিত সবজান্তার থেকে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ফারাক যে অনেকটাই। এত বছরের অভিজ্ঞতা, এত গুণীজনের সান্নিধ্য, বিস্তর পড়াশোনা, ইতিহাসকে এত কাছ থেকে দেখা, সেইসঙ্গে দুরন্ত বিশ্লেষণ। এর একটা আলাদা মূল্য তো আছেই। আবার এটাও ঠিক, এগুলো সবার ভাল লাগবে না। যাঁরা সেই ইতিহাস জানেন না, যাঁদের বিশ্লেষণ শোনার মতো মনন বা ধৈর্য নেই, তাঁদের ভাল না লাগারই কথা।

এখানে অহেতুক খেউড় নেই। গলা ফুলিয়ে চিৎকার নেই। অকারণ চাঞ্চল্য তৈরি করার মতো হেডিং নেই। এ এক শান্ত নদীর মতো। আপনি বুঝে সুঝেই স্নান করতে নামুন। ডেউয়ের তরঙ্গ হয়ত পাবেন না। তবে নদীর স্নিগ্ধতা পাবেন। এমন কিছু জানতে পারবেন,

যা আপনি আগে কোথাও শোনেনি। এমন কিছু বিশ্লেষণ পাবেন, যা শুনে মনে হবে, আগে তো এভাবে ভাবিনি। আটের দশক বা নয়ের দশকে দিল্লির রাজনীতির চেহারাটা কেমন ছিল, সেই ছবিটা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। স্বভাবতই সুমনবাবুর মেলামেশা যাঁদের সঙ্গে ছিল, তাঁদের কথা, স্মৃতিচারণ ঘুরেফিরে আসে। সেটাই তো স্বাভাবিক। কখনও জ্যোতি বসুর কথা, কখনও প্রণব মুখার্জির কথা, কখনও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির কথা। আবার কখনও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস, সোমনাথ চ্যাটার্জিদের কথাও। এইসব মানুষেরা নিজেদের কথা মুখ ফুটে জাহির করতেন না। ফলে, অনেকটাই অজানা থেকে গেছে। যাঁরা এঁদের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁদের মুখ থেকে যেটুকু জানা যায়। বিশ্লেষণের সঙ্গে আপনি একমত হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। কিন্তু শুনতে বা জানতে আপত্তি কোথায়?

এবার যাঁরা শুধু মমতা, মোদি ছাড়া কিছু বোঝেন না, তাঁদের ভাল নাও লাগতে পারে। যাঁদের রাজনীতি চর্চার দৌড় ওই ফেসবুকের কয়েকটা লঘু পোস্ট বা মিম, তাঁদের ভাল লাগার কথাও নয়। ভাল জিনিস গ্রহণ করতে গেলে একটা আধার লাগে। রবিশঙ্করের সেতার বা চৌরশিয়ার বাঁশি কি যাকে তাকে শোনানো যায়! তেমনই কিছু পড়াশোনা না থাকলে এই চ্যানেল আপনার ভাল লাগবে না। কোথাও কোনও ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা কি নেই? ১) অনেকসময় আলোচনার পরিসরটা বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। চল্লিশ মিনিট, পয়তাল্লিশ মিনিটও



হয়ে যাচ্ছে। ফলে, কিছু অতিকথন এসে যাচ্ছে। পুনরাবৃত্তিও এসে যাচ্ছে। অনেকের হয়ত এতখানি ধৈর্য না থাকতেও পারে। ২) বয়সের একটা প্রভাবও কাজ করছে। এক-সময় যেমন বাগ্মী ছিলেন, সেই ধার কিছুটা কমবে, সেটাই স্বাভাবিক। ৩) কিঞ্চিৎ আত্ম-প্রচারও এসে যাচ্ছে। তবে তিনি তো নিজের অভিজ্ঞতা বলতে বসেছেন। তাই একটু আধটু আসাটা অস্বাভাবিকও নয়। কোথাও কোথায় হয়ত একটু মাত্রা ছাড়াচ্ছে। ৪) তিনি যে খুব পেশাদারি ভঙ্গিতে করছেন, এমন নয়। করছেন কিছুটা আপন খেয়ালে। ফলে, অনেক সময় ধারাবাহিকতা থাকছে না। মাঝে মাঝেই বলেন, ‘রইল ঝোলা, চলল ভোলা’ করে কোনদিন পালিয়ে যাব।

তবে এরপরও বলতে হবে, রাজনীতি নিয়ে যাঁদের আগ্রহ আছে, যাঁরা আরও কিছু শিখতে চান, জানতে চান, তাঁরা এই চ্যানেলটি শুনতে পারেন। সব অনুষ্ঠান না হোক, যেগুলো ভাল লাগবে, সেগুলো শুনতে পারেন। দিনের শেষে আপনি কিন্তু সমৃদ্ধই হবেন। একটা মানুষের সারাজীবন ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতার কিছুটা ভাগ যদি আপনি পান, মন্দ কী! পরিশেষে, সুমনবাবুকেও অনুরোধ, দু একটা বিরূপ মন্তব্য দেখে বিচলিত হবেন না। এমন বেনোজল সর্বত্রই থাকে। তাঁদের পেছনে বেশি সময় বা মনযোগ কোনওটাই নষ্ট করার দরকার নেই। কিছু অর্বাচীন যেমন থাকবে, তেমনই মননশীল শ্রোতারও অভাব নেই। বাংলাফ্রিয়ারের এই নদী আপন খেয়ালে, তার নিজের মতো করে বয়ে চলুক। যার ইচ্ছে, সে নদীতে নামবে। কেউ না হয় দূর থেকেই দেখবে।

(মিডিয়া সমাচার। বেঙ্গল টাইমসের একটি জনপ্রিয় বিভাগ। এখানে থাকে মিডিয়া জগতের নানা অজানা কথা, বিশ্লেষণ। তা কোনও কাগজ নিয়ে হতে পারে, কোনও চ্যানেল নিয়ে হতে পারে। এমনকী ইদানীং মূলস্রোত মিডিয়ার সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেওয়া সোশ্যাল মিডিয়াও হতে পারে। পাঠকেরও আমন্ত্রণ। মিডিয়ার নানা দিক নিয়ে তাঁরাও পাঠাতে পারেন নিজেদের বিশ্লেষণ। তুলে ধরতে পারেন কোনও ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক গ্রুপকে।)

বোর্ড সভাপতির চেয়ার ছেড়ে ডাগআউটে বসতে হিম্মৎ লাগে

অজয় নন্দী

গতবছর আইপিএলের কথা মনে করুন। সেবার করোনার কারণে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়নি। তার বদলে হয়েছিল জমকালো সমাপ্তি অনুষ্ঠান। মধ্যমণি কে? সৌরভ গাঙ্গুলি। জয়ী দলের হাতে ট্রফিও তুলে দিয়েছিলেন বাংলার মহারাজ।

আগের দু'বারের আইপিএলেও তাই। মরুদেশেও মধ্যমণি সেই সৌরভই। মাত্র একবছরেই চিত্রনাট্যে কত পরিবর্তন। এখন তিনি বোর্ডে ব্রাত্য। তিনি ছাড়া সবাই রয়ে গেছেন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। আর তিনি! ফিরে এলেন ডাগ আউটে। কোর্ট-টাই থেকে আবার সেই ক্রিকেটের জার্সিতে।

জীবনের নানা বাঁকে কার জন্য কোন চিত্রনাট্য লেখা আছে, সত্যিই বোঝা মুশকিল। আমেদাবাদের জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁর থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি কিনা কোর্টলার মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডাগআউটে। দল একের পর এক ম্যাচ হেরে চলেছে। বাঁকা বাঁকা মন্তব্য ভেসে আসছে। তার মাঝেও তিনি বারবার সতীর্থদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। বারবার বলে চলেছেন, যা হয়েছে, ভুলে যাও। নতুন করে শুরু করো। পাঁচটা ম্যাচ হেরেছ তো



কী হয়েছে! সামনে নটা ম্যাচ বাকি! কে বলতে পারে, তোমরা সেই নটা ম্যাচে জিতবে না!

যা হয়েছে, ভুলে যাও। কথাটা বলা সহজ। কিন্তু কাজে করে দেখানো ততটাই কঠিন। কিন্তু তিনি সৌরভ গাঙ্গুলি। তিনি সব ভুলে নতুন করে শুরু করতে পারেন। তাঁর জায়গায় অন্য কেউ হলে এতদিনে গোসা ঘরে খিল দিয়ে বসতেন। একবার বোর্ড সভাপতি হওয়ার পর আবার একটা ফ্র্যাঞ্চাইজির কার্যত কোচিংয়ের দায়িত্ব নেওয়া! এ অনেকটা প্রধানমন্ত্রী থাকার পর একটা ছোট রাজ্যের রাজ্যপাল হওয়ার মতোই।

অন্য কেউ হলে এমন চ্যালেঞ্জ নিতেন! নিশ্চিতভাবেই এড়িয়ে যেতেন। আমি কোথায় ছিলাম, আজ কোথায় আছি! এটা ভেবে সারাক্ষণ হতাশায় ভুগতেন। কিন্তু তিনি জানেন, এটাই জীবন। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে। সেই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হবে। এটা কি শুধু ক্রিকেটীয় দিক? আমাদের জীবনেও তো এমনটা



আখ্‌হার ঘরে। কথায় কথায় আমরা নিজেদের বঞ্চিত ভেবে ফেলি। একটু অসম্মানিত হলেই পালিয়ে বাঁচার পথ খুঁজি।

কিন্তু পালিয়ে কি সত্যিই বাঁচা যায়! পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। সেটাই আসল লড়াই। একদিন আমি বোর্ড সভাপতি ছিলাম ঠিকই। আজ নেই। তাই বলে কি চুপ করে ঘরে বসে থাকব? আমার যেটা করার, আমি ঠিকই করে যাব। তাঁকে কি কম অস্বস্তি তাড়া করছে? বিরাট কোহলি তাঁর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন না। ইনস্টাগ্রামে আনফলো করে দিচ্ছেন। এই উপেক্ষা হজম করতে হচ্ছে। যে ধারাভাষ্যকাররা তাঁকে তোলাই দিয়ে যেতেন, তাঁরাও সুযোগ বুঝে বাঁকা মন্তব্যে ব্যস্ত। যে কর্তারা তাঁর আশেপাশে থাকার জন্য হুড়োহুড়ি করতেন, ছবি তোলায় জন্য ঠেলাঠেলি করতেন, আজ তাঁরা এড়িয়ে যাচ্ছেন। যদি এক ফ্রেমে ছবি উঠে যায়, অনেক বিপদ আছে।

তিনি কি এমন পরিস্থিতির কথা জানতেন না! বেশ জানতেন। এটুকু বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি তো তাঁর আছে। এরপরেও দায়িত্বটা নিয়েছেন। অনেকেই বলতে পারেন, টাকার জন্য। কী এমন টাকা পাবেন দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে। কয়েকটা বিজ্ঞাপন করলে বা কয়েকটা অনুষ্ঠানে ফিতে কাটলেই এর থেকে চের টাকা উপার্জন করতে পারেন। তাহলে, অন্তত বারবার এই অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলো তৈরি হত না।

এখানেই আর দশজনের সঙ্গে তাঁর ফারাক। ঠুনকো ইগো নিয়ে থাকা নয়। বরং অন্য পিচেও বুক চিতিয়ে ব্যাট করে যাওয়া। কোনও চ্যালেঞ্জকেই ছোট করে না নেওয়া। আইপিএলে সৌরভের দল কত নম্বরে থাকবে, জানা নেই। হয়ত সবার শেষে। কিন্তু দিনের শেষে চ্যাম্পিয়নও কিন্তু তিনিই। বোর্ড সভাপতি থাকার পরেও আবার মাঠে ফিরে আসার এমন নজির ভারত তো দূরের কথা, বিশ্ব ক্রিকেটেও নেই। কোনওদিন হবে, এমন সম্ভাবনাও কম।



নন্দ ঘোষের কড়চা

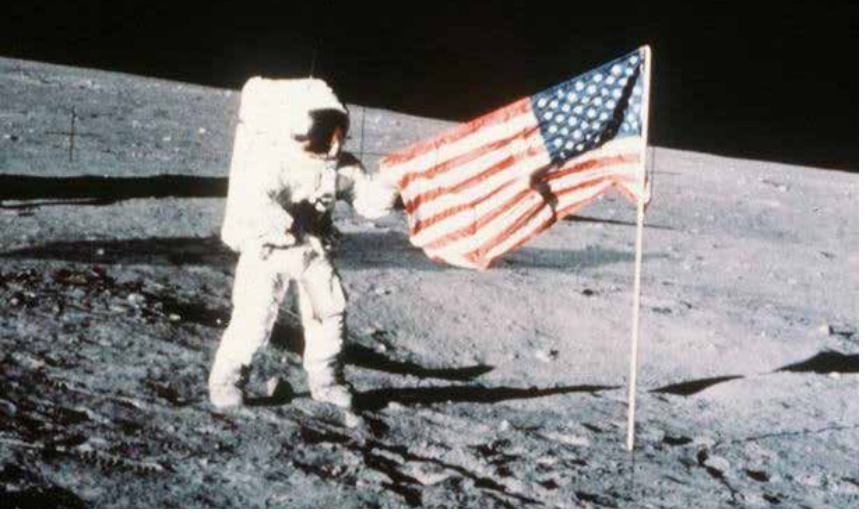
ছোট থেকেই মশাই ভুল ইতিহাস পড়ে আসছি। শুধু ইতিহাসই বা বলি কী করে? ভূগোল, বিজ্ঞান সব কিছুতেই গোঁজামিল। ছোট থেকেই শুনছি, নিল আমস্ট্রং নাকি চাঁদে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নাকি ছিলেন এডুইন অলড্রিন। তখন ছোট ছিলাম, যে যা বুঝিয়েছে, তাই বুঝেছি। এখন বুঝি, কতবড় গাঁজাখুরি ব্যাপার মাথায় ঢোকানো হয়েছিল।

এখন বুঝি, পুরোটাই ভাঁওতা। একসঙ্গে অনেকের ওপর রাগ হচ্ছে। ব্যাটা নিল আমস্ট্রং, আমাদের চোখে হিরো ছিল। সে কিনা এত বড় একটা বুজরুকি করল? চাঁদে না গিয়েই বলে দিল চাঁদে গিয়েছি? একগুচ্ছ বানানো ছবি বাজারে ছেড়ে দিল?

ডন ব্র্যাডম্যানের কথা তো ছেড়েই দিলাম। সুনীল গাভাসকার, শচীন তেড্ডুলকাররাও একবার ২০০ করার পর আবার করেছে। তেনজিং নোরগে একবার এভারেস্টে যাওয়ার পর আরও একবার গিয়েছিল। তাঁর ছেলেও গিয়ে ঘুরে এসেছে। আমস্ট্রং ভাই আর গেলেন না কেন? ওই অভিযানের পরেও আরও অন্তত ৪০ বছর বেঁচেছিলেন। এমন একজন

চাঁদে গিয়েছিলেন!
ইয়ার্কি হচ্ছে!

আবার নাকি চাঁদে লোক পাঠাচ্ছে নাসা। এবার আর একজন নয়, যাবেন চারজন। প্রায় চুয়ান্ন বছর আগে নাকি চাঁদে পৌঁছেছিলেন নিল আমস্ট্রং। ছোট থেকে ইতিহাসে আমরা সবাই এমনটাই পড়ে এসেছি। কিন্তু নন্দ ঘোষ বললেন, কভি নেহি। আমস্ট্রং মোটেই চাঁদে যাননি। এবার নন্দ ঘোষের কড়চায় একহাত নিলেন আমস্ট্রংবাবুকে।



মানুষের তো কিংবদন্তি হয়ে ওঠার কথা। কই, তাঁকে নিয়ে আর তেমন মাতামাতি তো হয়নি। এমনকী মারা যাওয়ার পর সেই খবরটাও কাগজে প্রায় লুকিয়ে ছাপতে হয়েছে।

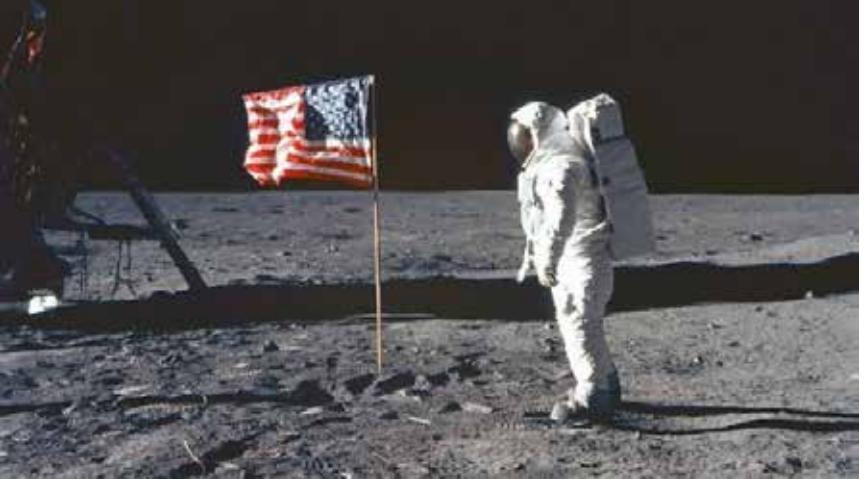
ব্যাটা আমেরিকা। তারাও প্রচার করে বেড়ালো, তারা নাকি চাঁদে লোক পাঠিয়েছে। গুলতানি মারার জায়গা পাওনি ? এতই যদি মুরোদ, তাহলে ১৯৬৯ এর পর থেকে আর পাঠাতে পারলে না কেন? পৃথিবী এত এগিয়ে গেল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এত এগিয়ে গেল, কই আর তো পাঠাতে পারলে না? আরেকবার জো বাইডেনকে পাঠাও দেখি, তাহলে বুঝব তোমাদের মুরোদ কত।

নাসা। সে নাকি বিজ্ঞানের বাইবেল। সে ব্যাটারাও কিনা গুলবাজ! তখন থেকেই নাশা যেন নেশায় আক্রান্ত। গাঁজা খেয়ে কী সব তত্ত্ব হাজির করেছিল। আমরা সব উজবুক। যেন

কিছুই বুঝি না। যা, আরেকবার যা দেখি, তাহলে বুঝব। শুনছি, আবার নাকি ৪ জনকে পাঠানো হবে। আচ্ছা, নাসায় কি ইলেকশন হয়! নইলে, এমন প্রতিশ্রুতির বহর কেন? আগে পাঠা, তারপর বাতেলা দিবি?

আমাদের রাজ্যের সিপিএম। কথায় কথায় এত আমেরিকা বিরোধীতা করে। আর আমেরিকা যে এতবড় ধাপ্লা দিল, তার বেলা নীরব। ৩৪ বছর ধরে সিলেবাসে এসব সাজিয়ে রেখেছিলে কেন বাপু? এমনিতে এত রাশিয়ার কথা শোনো। এই ব্যাপারটায় রাশিয়া বা চীনের কথা শুনলে না কেন? কেন আমেরিকার সুরে সুর মেলালে?

সিপিএম অবশ্য মাঝে মাঝেই ভুল স্বীকার করে। এবার স্বীকার করুক, চাঁদে মানুষ পাঠানোর মার্কিনি বুজুকি প্রচার করা ঐতিহাসিক ভুল ছিল।



আর কেউ চাঁদে যেতে পারল না!

৫৩ বছর পেরিয়ে গেল। আর কেউ চাঁদে যেতে পারলেন না? নিল আমস্ট্রংরা কি সত্যিই চাঁদে গিয়েছিলেন? নাকি বানানো এক গল্প? স্রোতের বিপরীতে গিয়ে অন্য এক ব্যাখ্যা তুলে আনলেন শুভেন্দু মণ্ডল।।

আবার নাকি চাঁদে মানুষ যাবে। এবার আর দুজন নয়, একেবারে চারজন। নাসা নাকি এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ১৯৬৯ এ মানুষ চাঁদে গিয়েছিল বলে যে প্রচার, তা কতটা মিথ, কতটা মিথ্যে? এই নিয়ে নানা মত চালু আছে। একটা মার্কিন মত, একটা বাকি পৃথিবীর মত। ইন্টারনেট মারফত কিছুটা পড়াশোনা করা গেল। মনে হল, ভিন্নমতটাও তুলে ধরা জরুরি।

এত দিনের পুষে রাখা ধারণাগুলো কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। আগে শুনতাম, ইউরেনাস,

নেপচুন, প্লুটো, এমনকি ভলকানোর কথা। এখন জানছি, ভলকানো তো দূরের কথা, প্লুটোও নাকি কোনও গ্রহ নয়।

ছোট বেলা থেকেই পড়ে আসছি, নিল আর্মস্ট্রং আর এডুইন অলড্রিন নাকি চাঁদে গিয়েছিলেন। ছোটবেলায় প্রচার ছিল রাকেশ শর্মাও নাকি চাঁদে গিয়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম, চাঁদ নয়, আসলে তিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিল আর্মস্ট্রংরা কি সত্যিই চাঁদে গিয়েছিলেন? তাই নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রশ্ন মনের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে। ইন্টারনেটে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, সারা বিশ্বেই এই প্রশ্নগুলো আছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই নাকি আমেরিকার এই চাঁদে লোক পাঠানোর তত্ত্ব মানতে পারেনি।

বিরুদ্ধ যুক্তিগুলো কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এক দুটো এখানে তুলে ধরা যাক।

১) চাঁদে তো হাওয়া নেই। তাহলে আমেরিকার পতাকাটা উড়ছে কী করে ?

২) সূর্য ছাড়া অন্য কোনও আলোর উৎস তো নেই। তাহলে ছায়াগুলি একে অন্যকে ছেদ করছে কেন ? দুজন দাঁড়িয়ে থাকলে ছায়া তো সমান্তরাল হওয়ার কথা।

৩) উষ্ণ বলয় ভেদ করে এত নিরাপদে চাঁদে পৌঁছে গেল ?

৪) চাঁদ তো হাতের সামনে নয়। চোন্দ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার দূরে। এতদূর একটা যান চলে গেল, ফিরেও এল? কত জ্বালানি লাগে? সেই জ্বালানি একটা যানে থাকা সম্ভব ?



৫) এতদিন অক্সিজেন ছাড়া থাকা যায়? কতগুলো অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হয়েছিল ?

৬) এখন তো প্রযুক্তি আরও অনেক উন্নত। তাহলে এই ৫৪ বছরে আর কেউ যেতে পারল না কেন?

৭) রাশিয়া, জাপান, চিন তো চেষ্টা করতে পারত। তারা কেউ চেষ্টা করল না কেন?

৮) আমেরিকা আদৌ চাঁদে লোক পাঠিয়েছিল কিনা, তা নিয়ে যখন এত সংশয়, তখন সেই সংশয় ভেঙে দিতে আমেরিকাই বা আবার চন্দ্র অভিযান করল না কেন?

৯) চাঁদ তোলা কোনও ছবিতেই কোনও তারা দেখা যাচ্ছে না কেন?

১০) এত গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। তার টেলিমেট্রি ডাটা কেথায়? নাসার যুক্তি, সেটা নাকি হারিয়ে গেছে? এটা কখনও বিশ্বাসযোগ্য? সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তোলা অভিযানের নথি কেউ হারিয়ে ফেলে ?



১৪) উন্নত দেশগুলির অনেকেই চাঁদে যাওয়ার মার্কিন তত্ত্ব বিশ্বাস করেনি। তাদের দেশের ইতিহাস বা ভূগোল বইয়ে এই সংক্রান্ত কোনও কথা নেই।

১৫) নিল আমস্ট্রং মারা গেলেন এক দশক আগে- ২০১২ সালে।

১১) শোনা যায়, এটি নাকি সুন্দরভাবে সাজানো একটি ভিডিও। কোনও এক মরু অঞ্চলে নাকি এর গুটিং হয়েছিল। পরিচালক ছিলেন হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক।

১২) বিল কেসিং। আমেরিকার রকেট প্রযুক্তির প্রবক্তা। তিনি ১৯৭৪ সালে একটি বই লেখেন। নির্ঘাস - আমেরিকার ৩০ বিলিয়ন ডলারের জোচ্ছুরি। সেই বইয়ে তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করেন, আমরা কখনই চাঁদে যাইনি। এটা বিশ্ববাসীর সঙ্গে একটা মস্তবড় প্রতারণা।

১৩) গাস থ্রিসাম নামে আরও এক নভোচারি ছিলেন। তিনি রহস্যনজকভাবে নিহত হন। অনেকে মনে করেন, তিনি এই প্রতারণার কথা জানিয়ে দিতেন। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এত বছর বেঁচে থাকার পরেও তিনি সারা বিশ্বে সেই কিংবদন্তির মর্যাদা পাননি। এমনকি আমেরিকাও প্রথমদিকে তাঁকে নিয়ে লাফালাফি করলেও পরের দিকে বিষয়টা অনেকটা চেপে গিয়েছিল।

এইসব নানা কারণে প্রশ্ন উঠছে। আমাদের শিশুরা জানছে, চাঁদে মানুষ গিয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তিগুলোও তো উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। প্রশ্নহীন আনুগত্য নিয়ে আমরা সবকিছু কেন মেনে নিচ্ছি? আমার মনে হয়, খোলা মনে সবকিছু আরও নতুন করে ভাবা দরকার। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কী বলছেন, সেই ব্যাখ্যাও শোনা দরকার।



কোনও বুকিং ছাড়াই হাজির পাহাড়ি গ্রামে

শুভেন্দু দেবনাথ

বেঙ্গল টাইমসে বেড়ানোর
নানারকম কাহিনী পড়ি। বেশ
লাগে। আমার নিজের একটা
বেড়ানোর গল্প শেয়ার করতে
ইচ্ছে করছে।

বছর তিনেক আগেকার ঘটনা।
দার্জিলিঙে গিয়েছিলাম। ঠিক
ভাল লাগছিল না। তিনজনের
টিম। দুদিনেই অনেকটা ঘোরা
হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল,
এবার অন্য কোথাও গেলে
কেমন হয়। হাতে তখনও
তিনদিন। কারণ, তিনদিন

বাদে ফেরার টিকিট। এই
তিনদিনে কোথাও একটা
যাওয়াই যায়।

দুই বন্ধু একমত হলাম,
কার্শিয়াংয়ের কাছে
ডাউহিলে গেলে কেমন
হয়! জায়গাটা দারুণ, কিন্তু
থাকার জায়গার অভাব।
একটা ফরেস্টের বাংলা
আছে। কিন্তু বুকিংয়ের
হাজার ঝামেলা। ডিএফও
-কে ফ্যান্স করতে হবে।
তারপর কবে তার রিপ্লাই
আসবে, কে জানে! উত্তর
ইতিবাচক হওয়ার
সম্ভাবনাও কম।

হঠাৎ, চোখে পড়ল দার্জিলিং
ডিএফও-র অফিস। সাহস
করে ঢুকেই পড়লাম।
নিজেদের ইচ্ছের কথা
জানালাম। উনি বললেন, এটা
তো আমার কিছু করার নেই।
ওটা কার্শিয়াং ডিএফও-র
আন্ডারে পড়ছে।

তাঁকে বললাম, অতশত
জানি না। আপনিই কিছু
একটা ব্যবস্থা করে দিন।
আমরা চেষ্টা করলে হবে
না, এটুকু জানি। আপনি
চেষ্টা করলে হতেও
পারে। একটু চেষ্টা করে
দেখুন না।

উনি বললেন, কাল আসুন।
আমি দেখে রাখব। যথারীতি
পরের দিন গেলাম তাঁর
দপ্তরে। বললেন, ‘ওখানে
এখন মেরামতি হচ্ছে।
আপনারা বরং মিরিক
চলে যান।’ কেন জানি না,
মন সায় দিল না। আগেও
মিরিক গেছি। আলাদা করে
দুদিন থাকার মানে হয় না।

অগত্যা সেইদিনই একটা
গাড়ি ধরে নেমে গেলাম।
ঠিক করলাম, কাশিয়াংয়ে
নামব। তারপর আশেপাশের
কোথাও একটা জায়গা ঠিক
খুঁজে নেব। গাড়িতেই
একজনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল।
আশেপাশে কোথাও রেয়ার
স্পট আছে কিনা। তিনি
বললেন চিমনির কথা।
কাকে একটা ফোন করে নম্বরও জেনে নিলেন।

ফোন করা হল। যিনি ধরলেন, তিনি সটান
জানিয়ে দিলেন রুম খালি নেই। কী আর করা
যাবে। মন মরা হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ,
মাথায় একটা দুষ্টি বুদ্ধি চেপে গেল। মনে হল,
চিমনির সেই ভদ্রলোককে আবার ফোন করি।
করলাম। শুরুতেই বললাম, দেখুন, আমি
জানি আপনি বলবেন রুম নেই। আপনার
‘না’ শোনার জন্য ফোন করিনি। আমরা
আসছি। আপনি ব্যবস্থা করুন। এটা বলার
জন্য ফোন করেছি।

উনি তো ঘাবড়ে গেলেন। আমতা আমতা



করে হিন্দি – নেপালি মিশিয়ে বলতে চাইলেন,
রুম নেই। আমরাও নাছোড়। বললাম, শুনুন
ভাইয়া, এতদূর থেকে যখন এসেছি, তখন
ফিরে যাব না। আমরা থাকব, ব্যাস। কোথায়
রাখবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। আমরা
রান্নাঘরেও থাকতে পারি। ডাইনিংয়েও
থাকতে পারি। আপনার ঘরেও থাকতে পারি।
আপনি বরং এক-দু রাতের জন্য অন্য ঠিকানা
খুঁজে নিন। কোনও বন্ধু বা আত্মীয়র বাড়িতে
চলে যান।

এমন আজগুবি আবদার সে নিশ্চয় এই জন্মে
শোনেনি। কাশিয়াং থেকে একটা আলাদা
গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম চিমনির দিকে।
অনেকটাই ডাউহিলের রাস্তায়। ইচ্ছে ছিল



একবার ডাউহিলে নামার। কিন্তু এমন বৃষ্টি, নামার সুযোগ হল না। গাড়ি চলল চিমনির দিকে। গিয়ে থামল সেই হোম স্টে-র সামনে।

চমৎকার হোম স্টে। পুরোটাই প্রায় ফাঁকা। মালিক বেরিয়ে এলেন। বললাম, এসে গেছি। এবার ব্যবস্থা করুন। উনি একটা সুন্দর ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন। বললাম, ‘পুরোটাই তো ফাঁকা, তাহলে যে বললেন রুম নেই।’ উনি কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললেন, আসলে এক-দুটো রুমে লোক রেখে লাভ হয় না। সেই এক-দুজনের জন্য রান্না করতে হয়। এক সঙ্গে অন্তত তিন-চারটে রুমে

বুकिং থাকলে সুবিধা হয়। সেই কারণেই বলেছিলাম, রুম নেই।

তাঁর সমস্যাটা বুঝলাম। তিনি যে সত্যিটা বললেন, সেটা জেনে ভালও লাগল। আমরা আপাতত দুদিনের অতিথি। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা, সারাক্ষণ বৃষ্টি। বৃষ্টিটা দারুণ ভাবে উপভোগ করেছিলাম। প্রাণখুলে আড্ডা দিয়েছিলাম। কত গান গেয়েছিলাম। কত পুরানো স্মৃতি হাতড়েছিলাম। আর মাঝে মাঝেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। এর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিছি। দ্বিতীয় দিন একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখলাম।

রাস্তাটা তখন একেবারে এবড়ো খেবড়ো ছিল। শুনলাম, কয়েকদিন পরেই নাকি ঠিক হয়ে যাবে। জানি না, আজও ঠিক হয়েছে কিনা।

ওই দুর্গম পাহাড়ি পথেও ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। যাওয়াটা না হয় সহজ। নেমে গেলেই হয়। কিন্তু কাশিয়াং থেকে হেঁটে ফিরে আসছে! সত্যিই পেনাম করতে ইচ্ছে হল। আমরা যদি এই দুর্গম এলাকায় থাকতাম, কোনকাল লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিতাম। ড্রপ আউটের তালিকায় আমাদের নামগুলো জ্বলজ্বল করত।

সবমিলিয়ে দুদিনের ট্যুরটা

মন্দ হয়নি। মাঝে মাঝে রোদ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। গ্রাম্য কিছু দোকান। ইচ্ছেমতো মোমো, সিঙ্গাড়া খাওয়াই যায়। কতরকম ফলের গাছ। গোটা গ্রামটাই যেন নিজেদের গ্রাম। যেন যার ঘরে যখন খুশি ঢুকে পড়া যায়। ইচ্ছে হল, একজনের বাড়িতে চা খাব। এক আন্টিকে বলামাত্রই হাসিমুখে রাজি। তিনি চা করে আনলেন। চা-টা যে দারুণ এমন নয়। কিন্তু ওই আতিথেয়তা! সত্যিই তুলনা হয় না। মানুষগুলো কত সহজ-সরল। একবার ভাবুন তো বেহালায় বা বরানগরে কোনও বাড়িতে গিয়ে আপনি চা খেতে চাইছেন। ইভটিজার বা চোর ভেবে গণপিটুনিও জুটে যেতে পারে। অথচ, ওঁরা কত সহজ-সরল। কত অতিথি বৎসল। ওঁদের ওই হাসিমুখগুলো দেখে আমাদেরও যেন আবদার করতে সংকোচ হয় না।

আবার যদি কখনও সুযোগ পাই, সেই গ্রামে যাব। জানি না, কখন যাওয়া হবে। যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। নেটে চিমনি লিখে সার্চ মারলেই অনেক ছবি, তথ্য পেয়ে যাবেন। দুটো দিন নিরিবিবি পাহাড়ি গ্রামে ঘুরে আসতে চাইলে আপনার ঠিকানা হতেই পারে চিমনি।

বেড়ানোর এমন নানা বিচিত্র গল্প আপনিও তুলে ধরতে পারেন। বেঙ্গল টাইমসে লিখে পাঠিয়ে দিন আপনার অভিজ্ঞতা। লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com



ভ্রমণ

পলাতক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

শান্তনু দেশাই

ঝিরঝিরি বৃষ্টিতে ঝমঝম করে একটা ব্রিজ
পেরোলো ট্রেনটা। নদীর নাম দেখলাম
ডায়না। ভারী সুন্দর তার গড়ন। জিজ্ঞেস
করলাম, হ্যাঁ গো তুমি বিদেশি নাকি?
কলকলিয়ে হেসে বললো কেন গো? নদীর
আবার দেশ বিদেশ হয় নাকি?
আমাদের তো সারা বিশ্ব এক দেশ। সকলেই
আমরা কারো না কারোর সঙ্গে জড়িয়ে
আছি। তোমরা নিজেদের মত করে ভাগ
করে নিয়েছ।

লজ্জায় পড়ে গেলাম। সত্যি তো আমরাই
বিশ্বকে বিভাজিত করেছি।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ। ভালোই
হোল। আমি ডায়নার সাথে বেশ কিছুক্ষণ
গল্প করার সুযোগ পেলাম। ডায়না, তিস্তা,
তোর্ষার খোঁজ নিল। আমাকে সুখালো
কোথায় যাচ্ছি।

বললাম কোথাও নয় গো। এমনি অলস
ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ডায়না বললো, ও, পলাতক ছবির রেশ
নাকি !

নাঃ, সে আর পারি কই।



ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে দুলে উঠল। ডায়না কে
বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম। জানালায়
বাইরে সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। আমার
কল্প জগৎ সারাক্ষণ অনুরিত হচ্ছে সেই
চলমান দৃশ্যের।

আমি একটু বেশিই কল্পনা প্রবণ।

কৈশোর বয়সেও সাহিত্য পরীক্ষায় বিজ্ঞান
আশীর্বাদ না অভিশাপ, নিয়মানুবর্তিতা, বা



কোনও মনীষীদের অবদান রচনা ছেড়ে
আমি একদম শেষে থাকা একটি বট গাছের
আত্মকথা বা একটি নদীর আত্মকথা লিখতে
পছন্দ করতাম।
কলেজে নীরস লেকচারের ফাঁকে খোলা
জানালা দিয়ে বাইরের ঘুরপাক খেয়ে ওঠা
ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে বিভোর হয়ে যেতাম।
সেই কল্পনার কলতান ইদানিং একটু কমেছে
সাংসারিক চাপের কারণে। মনের চাতালে
শ্যাওলা জমেছে।
তবু আজও সুযোগ পেলেই মন উড়ি উড়ি।
ট্রেনের আরামপ্রদ চেয়ারে প্রায় সকলেই
মুঠো ফোনে মগ্ন। জানি না কি দেখেন,
শোনেন। ট্রেনের জানালার বাইরে তখন
একটা ছোট্ট গ্রাম। অনেক সুপারি গাছ,
দরমার বেড়া দেয়া গোয়ালঘর। টিনের চালা
দেয়া দু কামরার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে।
হয়তো কেউ কাচি মাছের বাটি চচ্চড়ি
বসিয়েছে। ঝাল ঝাল কুল লঙ্কা দিয়ে সে বড়
লোভনীয়।
বেশ কদিন ধরেই এদিকে তুমুল বৃষ্টি
হয়েছে। খাল বিল গুলো ভর ভর। তাতে

কয়েকজন বাঁশের ঘনি দিয়ে মাছ ধরার
চেঁচায়। আনারস ক্ষেতে জল ঢুকেছে। একটা
মন্দির জেগে আছে। তার চাতালে দুইজন
বসে।
ভাবি ওরা কি নিয়ে কথা বলছে।
ডবল ডোজ, বুস্টার, নিউ ভ্যারিয়েন্ট এইসব
শব্দ কি ওদের জানা?
সেভক স্টেশন এ বিরাট কর্মযজ্ঞ চলাছে।
আমাদের শহুরে স্বাচ্ছন্দ্যের বলি কয়েক
হাজার গাছ।
শুধুই কি গাছ? তাতে থাকা কত পতঙ্গ,
পাখি ? ওরা কোথায় যাবে ?
কতদিন জোনাকি দেখিনা।
রাঙারুনে হোম স্টের বারান্দায় বসে দূরে
আলোকমালায় সজ্জিত দার্জিলিং শহরকে
দেখে জোনাকি দেখার স্বাদ মেটাই।
আমরা খুব হিংস্র।
ভাবনায় ছেদ পড়ে হকারের ঝালমুড়ির
আওয়াজে। কি সুন্দর সাজানো।
কিন্তু আমি যে সব কিছু সাজানো পছন্দ
করি না। একটু অগোছালো থাকাকও ভালো।
সাজানোর সুযোগ থাকবে তো।

এই দেখোনা সাজানো কাশ্মীর ভ্রমণ করতে
গিয়ে মনটা একদম অগোছালো হয়ে গেল।
হৈ হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি করে বেহাল।
অশান্ত মনকে শান্তি দিতে তিনদিনের ছুটিতে
চলে এলাম বর্ষার দার্জিলিংয়ে।
কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কোলাহল নেই।
টিপটিপ বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় অলসভাবে
লেবণ্ড কার্ট রোড, ভুটিয়া বস্তি, মহাকাল
মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।
চাইনি তবু সে দেখা দিল।
গুনগুন করে গান শোনালাম... আমি আপন
করিয়া চাইনি তোমারে, তুমি তো আপন
হয়েছো।
লাজুক হেসে মেঘের চাদরে ঘোমটা দিল।
এই বেশ।
রোহিনীর রাস্তা ধরে শেয়ার জিপে যখন
আসছিলাম তখনই চোখে সবুজের আস্ত-
রণ ঘন হয়ে লেপ্টে গিয়েছিল।
জোড় বাংলা নেমে উল্টোদিকের রাস্তা
ধরে তিন মাইল এসে যখন রাস্তার
এর রাস্তা ধরলাম সে সবুজ আঞ্জলত করে
দিল।
কোথাও ঈষৎ হলুদাভ, কোথাও গাড়
সবুজের শেড। জনমনিষির চিহ্ন মাত্র
নেই সারা রাস্তা জুড়ে।
ট্রেকার্স হাট, খালিঙ্গ হোম স্টে পেরিয়ে
আশ্রয় নিলাম নিলম হোম স্টে তে।
ছোট্ট ছিমছাম ঘর বারান্দা। রাঙারুন এর
চা বাগান এই অঞ্চলের সবথেকে প্রাচীন।
দুঃখের বিষয় চা কারখানা টি বন্ধ। পূর্বের
শ্রমিকরা কেউ দূরের বাগানে কাজ

নিয়েছে, কেউ ঘরের সামনে দোকান
করে দিন গুজরান করে।
পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেশ লাগছিল।
কিছুটা দূরেই লাকপা হোম স্টে। সবথেকে
সেরা লোকেশন। ঘর থেকেই চা বাগান
সহ টাইগার হিল, দার্জিলিং শহর দৃশ্যমান।
গাঁয়ের নীচে নদী। অন্য সময় জল থাকেনা।
নদী পেরিয়ে পাহাড় চড়ে টি এন রোড ধরে
দার্জিলিং যাওয়া যায়।
আমার সে আশায় জল ঢেলে দিল নদী। জল
বিপদজনক ভাবে বয়ে চলেছে। পারাপার
মুশকিল।
পরদিন রাঙারুন কে বিদায় জানিয়ে চলে
এসেছিলাম দার্জিলিং।
আস্তাবল পেরিয়ে ম্যাল থেকে একশ মিটার
দূরে সস্তার হোট্টেলে এক রাত কাটিয়ে
নেমে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি।
ভবঘুরের মত ইচ্ছে নিয়ে কোনও
গন্তব্য রাখলাম না। সকালের ট্রেন ধরে
ডুয়ার্সের ঘন সবুজ গায়ে মেখে, চোখে
লেপটে পৌছেছিলাম আলিপুরদুয়ার।
খানিক বিশ্রাম আর দুপুরের ভোজন
সেরে ফিরতি পথে ডুয়ার্স রানী কাঞ্চন
কন্যা ধরে বাড়ির পথে পা বাড়ানো।
রাজাভাতখাওয়া স্টেশন এর পাশে নুড়ি
পাথরের খাঁজে অনেক অনেক প্রজাপতি
উড়ছে, বসছে ঘুরছে। কিতাবি ভাষায়
মাদ পুডলিং বলে।
ওরা ডাক দিল, আসবে না?
বললাম, আসবো আর একদিন,
আজ যাই।



গোলপাহাড়ের টিলায় বসে...

শ্যামল মুখার্জি

পাহাড় বলবেন নাকি ছোট ছোট টিলা! দলমা রেঞ্জের দিকে গেলে এমন কত অসংখ্য টিলা দেখা যায়। কোনওটা রুক্ষ, কোনওটা আগাছায় ঢাকা। ট্রেনে যেতে যেতে বা বাসে যেতে যেতে দূর থেকেই সেইসব টিলা দেখেছি। কাছে যাওয়া হয়নি। কী জানি, যদি সাপথোপ থাকে! যদি বন্য জন্তু থাকে। তাছাড়া, ওই টিলায় কোন বাস দাঁড়াতে যাবে! কেনই বা দাঁড়াতে যাবে!

এই টিলা একেবারেই অন্যরকম। পাহাড়ের

ঢালে চা-বাগান নতুন কিছু নয়। পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে উঠতে এমন কত বাগান উঁকি দেবে। কিন্তু এই গোলপাহাড়ের সৌন্দর্য অন্যরকম। একের পর এক ছোট্ট গোল গোল পাহাড়। সবগুলিই প্রায় একই উচ্চতার। সব ছোট পাহাড়গুলোই চা-গাছে ঘেরা। ধূসর বা রুক্ষ বাগান নয়, চরাচরজুড়ে সবুজের অভিযান। দু'পাশে দুটো গোল পাহাড়, মাঝের রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, দৃশ্যটা ভাবলেই অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ এসে যায়।

এই পথে বেশ কয়েকবার পেরিয়ে গেছি।

মিরিক থেকে দার্জিলিং ওঠার রুট। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার একটা রাস্তা উঠে গেছে কাশিয়াং হয়ে। অঞ্জন দত্তর গানের ভাষায়, টুং, সোনাদা, ঘুম পেরিয়ে। সবাই এই রাস্তা দিয়েই ওঠেন। কারণ, সময় কিছুটা কম লাগে। কিন্তু হাতে যদি একটু বাড়তি সময় থাকে, তাহলে একবার মিরিক হয়ে উঠতে পারেন। যাওয়ার পথেই নেপাল সীমান্ত, টুক করে একবার ঝটিকা সফরে বিদেশ ভ্রমণ করে নিতে পারেন। নিদেন পক্ষে ওপারে গিয়ে এক কাপ চাও খেয়ে আসতে পারেন। আবার ভারতের ভূখণ্ডে ফিরে এসে সুখিয়া পোখরি, লেপচা জগৎ, ঘুম হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে যেতে পারেন।

দূরত্ব একটু বেশি ঠিকই, তবে চা-বাগান আর পাইন বনে ঘেরা রাস্তা একটা বাড়তি রোমাঞ্চ এনে দেবে। আমাদের এই গোলপাহাড় অবশ্য এতটা দূরে নয়। তার অনেক আগেই। ধরে নিন মিরিক থেকে আরও আধ ঘণ্টার মতো। এখানে



পাহাড়টা একেবারেই অন্য রকম। ছোট ছোট টিলা। সাহেবরা চা-বাগান বানাতে গিয়ে দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটাও মাথায় রেখেছিলেন। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, আর কোথাও যাওয়ার দরকার পড়বে না।

এর সন্ধান দিয়েছিলেন তাবাকোশির বিজয় সুব্বা। তাঁর হোম স্টেতেই ছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোথায়? সেই সিদ্ধান্তের ভার তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনিই বলেছিলেন, নেপাল সীমান্তের কাছে একটা গ্রাম আছে, একেবারে চা-বাগানের মাঝেই। দেখুন, আপনাদের ভাল লাগবে। তিনিই সন্ধান দিয়েছিলেন মঞ্জোশীলা হোম স্টের। আসলে, তাবাকোশি

এতটাই ভাল লেগেছিল যে সংশয় হচ্ছিল, পরের জায়গাটা যদি ভাল না হয়। কিন্তু গন্তব্য যত এগিয়ে আসছে, মুগ্ধতা যেন তত বাড়ছে। পাইন গাছের জঙ্গল থেকে মেঘ ভেসে আসছে। সঙ্গে দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান তো আছেই। যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানেই ভিউ পয়েন্ট।

দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম মঞ্জোশীলায়। একমুখ হাঁসি নিয়ে হাজির মনোজ তামাং। ভারী চমৎকার মানুষ। এমন সরল, আন্তরিক ও অতিথি পরায়ণ মানুষ চাইলেও ভুলতে পারবেন না। পুরো বাড়িটাই পাইন কাঠে মোড়া। সামনে ছোট একফালি উঠোন। সেখানে



বসলেই হাতের সামনে ধরা দেবে সেই গোলপাহাড়। ঘরের বিছানায় বসে মনে হবে, জানালার ওপারেই যেন চা বাগান। এত কাছ থেকে এমন সুন্দর বাগান দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। মনের মধ্যে জমে থাকা নাগরিক ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি একলহমায় যেন হারিয়ে যায়। মনে হবে, চুলোয় যাক কাজবাজ, চুলোয় যাক ব্যস্ততা। সব ছেড়ে এখানেই থেকে যাই। সঙ্গে যদি এমন আতিথেয়তা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। একটা ছোট সতর্কীকরণ: দিনের বেলা বেশ রোমাঞ্চকর। তবে সূর্য ডুবলে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। তাই পর্যাপ্ত শীতপোশাক নিয়ে যাওয়াই ভাল।

আলাদা করে কোনও গাড়ি নেওয়ার দরকার নেই। আলতো পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যান গোলপাহাড় ভিউ পয়েন্টের দিকে। হাঁটা পথে মিনিট দশ। দু-পাশে খাড়া চা-বাগান। আপনি আপন মনে হেঁটে যান। যতদূর মন চায়। কখনও ইচ্ছে হলে কোনও এক টিলায় উঠে পড়ুন। ছবি তোলায় শখ থাকলে এটুকু হলফ করে বলা যায়, আপনার সেরা মুহূর্তগুলো হয়ত এই গোলপাহাড়ের জন্যই তোলা আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য ঘটা করে টাইগার হিল যেতে হবে না। হোম স্টের সামনের ওই ছোট পাহাড়ে উঠে পড়ুন। পাহাড় শূন্যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উঠতে লাগবে বড়জোর মিনিট দশেক। বয়স্করাও অনায়াসে উঠে পড়তে পারেন। একটু শুধু সাত সকালে উঠে পড়ুন। সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি কীভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর ঠিকরে পড়ছে, কীভাবে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা ছন্দে ছন্দে রঙ বদলাচ্ছে, দেখতে থাকুন। কখনও হয়ে উঠছে বাদামি, কখনও সোনালি, আবার কখনও ঝকঝকে সাদা।

ছবি কত কথা বলে যায়! গুগলবাবু তো আছে। একবার গোলপাহাড় লিখে দেখুন। তাহলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাইলে ইউটিউবের শরণ নিতেই পারেন। একবার শুধু একঝলক দেখে নিন। যেমন দেখছেন, তার থেকে ঢের ভাল। তথাকথিত দার্জিলিং, গ্যাংটক তো অনেক দেখেছেন। এবারের ঠিকানা হোক একটু নিরিবিলিতে। ওই গোলপাহাড়ে অলসভাবে দুটো দিন কাটিয়ে আসুন।

বঙ্গ টাইমস

১৬ এপ্রিল, ২০২৩

